

শিবতত্ত্ব ও শিবরাত্রির তাৎপর্য

— স্বামী গুণালয়ানন্দ

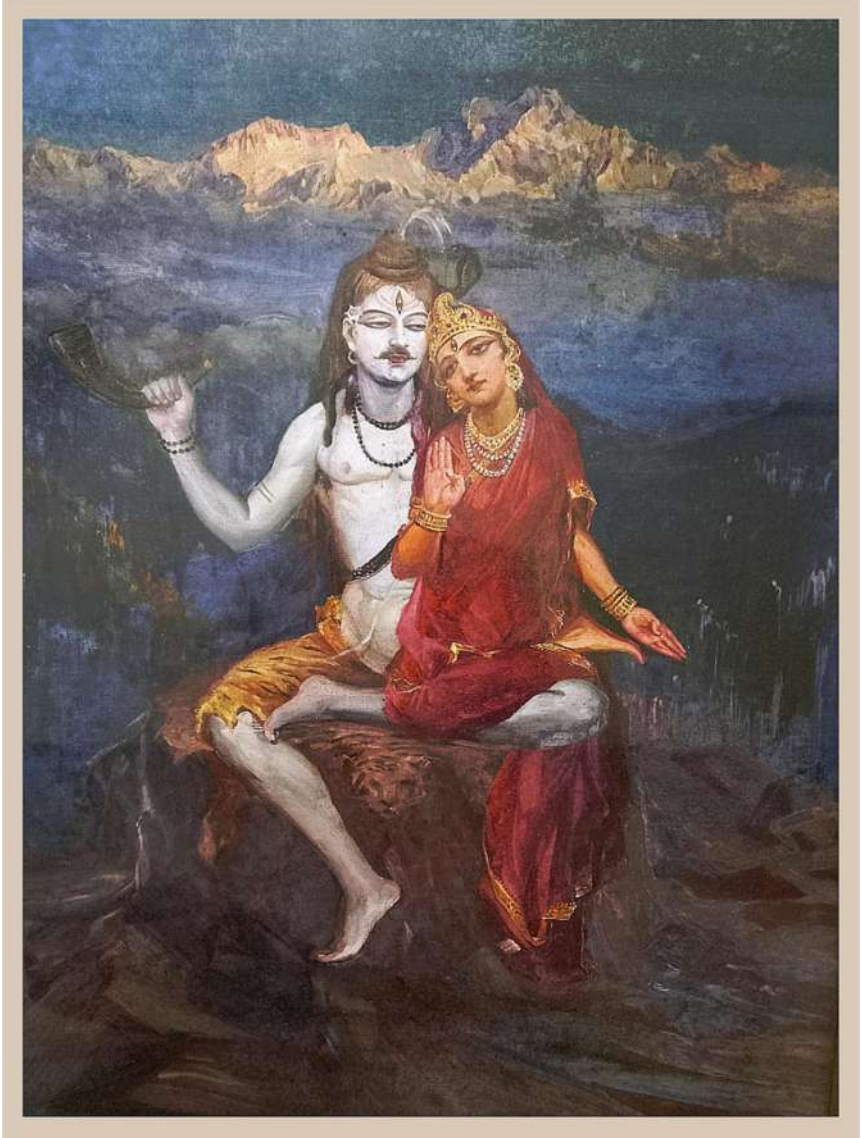




শিবতত্ত্ব ও শিবরাত্রির ত্যাগপৰ্ম স্বামী গুণানন্দানন্দ

সূচীপত্র

- ১) মঙ্গলাচরণ – ৪
- ২) শিবমূর্তির তত্ত্ব – ৬
- ৩) ‘শিব’ নামের অর্থ – ১৪
- ৪) সন্ন্যাসী ও গৃহীর আদর্শ শিব – ১৬
- ৫) শিবলিঙ্গ কি? – ১৮
- ৬) শিব ও শিবলিঙ্গের সম্পর্ক – ২২
- ৭) শিবরাত্রি-ব্রত – ২৮
- ৮) সৃষ্টিতত্ত্ব ও আদি-শিবরাত্রি – ৩৪
- ৯) স্থিতিতত্ত্ব ও ব্যক্ত-শিবরাত্রি – ৩৮
- ১০) সংহারতত্ত্ব ও অব্যক্ত-শিবরাত্রি – ৪৮
- ১১) তিরোধানতত্ত্ব ও গুহ্য-শিবরাত্রি – ৫৬
- ১২) অনুগ্রহতত্ত্ব ও পরম-শিবরাত্রি – ৬০
- ১৩) শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা এযুগের
হরগৌরী – ৬৪
- ১৪) রুদ্রস্তুতি – ৭২



॥ॐ अथाग्नानं शिवाग्नानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्॥



॥१॥

মঙ্গলাচরণ :—

যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে মহাযোগী
মহাত্যাগী মহাজ্ঞানী মহাপ্রেমিক,
যিনি জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী যুগজননী
মায়ের দৃষ্টিতে ভৈরব জগন্নাথ, যিনি
বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে পরহিত
প্রচেষ্টায় প্রাণপ্রচ্ছেদপ্রীত নিমীলিত
নয়ন নীলকণ্ঠ, যিনি সুউচ্চ উত্তরে
কাশ্মীর শৈবদর্শনে অভিবন্দিত
তুষারময় অমরনাথ, যিনি সুদূর
দক্ষিণে সমুদ্রজলাভিষিক্ত সিকতাময়
রামেশ্বর, যিনি অতিদূর পশ্চিমে
বৈভবময় সোমনাথ, যিনি দুর্গম পূর্বে
স্পর্শমগিময় চন্দ্রনাথ, যিনি
উর্ধ্বাকাশে তারকেশ্বর, মর্তলোকে
মহাকাল, পাতালে হাটকেশ্বর, যিনি
অন্তর্বক্ষাণ্ডে স্বয়ম্ভু বাণ ইতরাখ্য ও
পরমশিব নামে কথিত, যিনি সৃজনে
নটরাজ, পালনে পশুপতি, শাসনে
কালভৈরব, কৃপায় দক্ষিণামূর্তি,
দারিদ্র্যহরণে কুবেরভাগুরী,

আরোগ্যে বৈদ্যনাথ, প্রাণদানে মৃত্যুঞ্জয়, যুদ্ধে শরভ, সংহারে কালাগ্নিরুদ্ধ, মুক্তিতে
বিশ্বনাথ, জ্ঞানে সদাশিব, যোগে শ্রীনাথ, কর্মে আঞ্জনেয় মহাবীর, ভক্তিতে আশুতোষ,
প্রেমে অর্ধনারী, সন্তানে বটুক, সমন্বয়ে হরিহর, যিনি অষ্টমূর্তিতে জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছেন
— তিনিই নিখিল বিশ্বের প্রতিটি জীবের হৃদয়গুহায় নিবাসকারী আত্মার স্বরূপ সোহহম্ —
শিবমদ্বৈতম্।



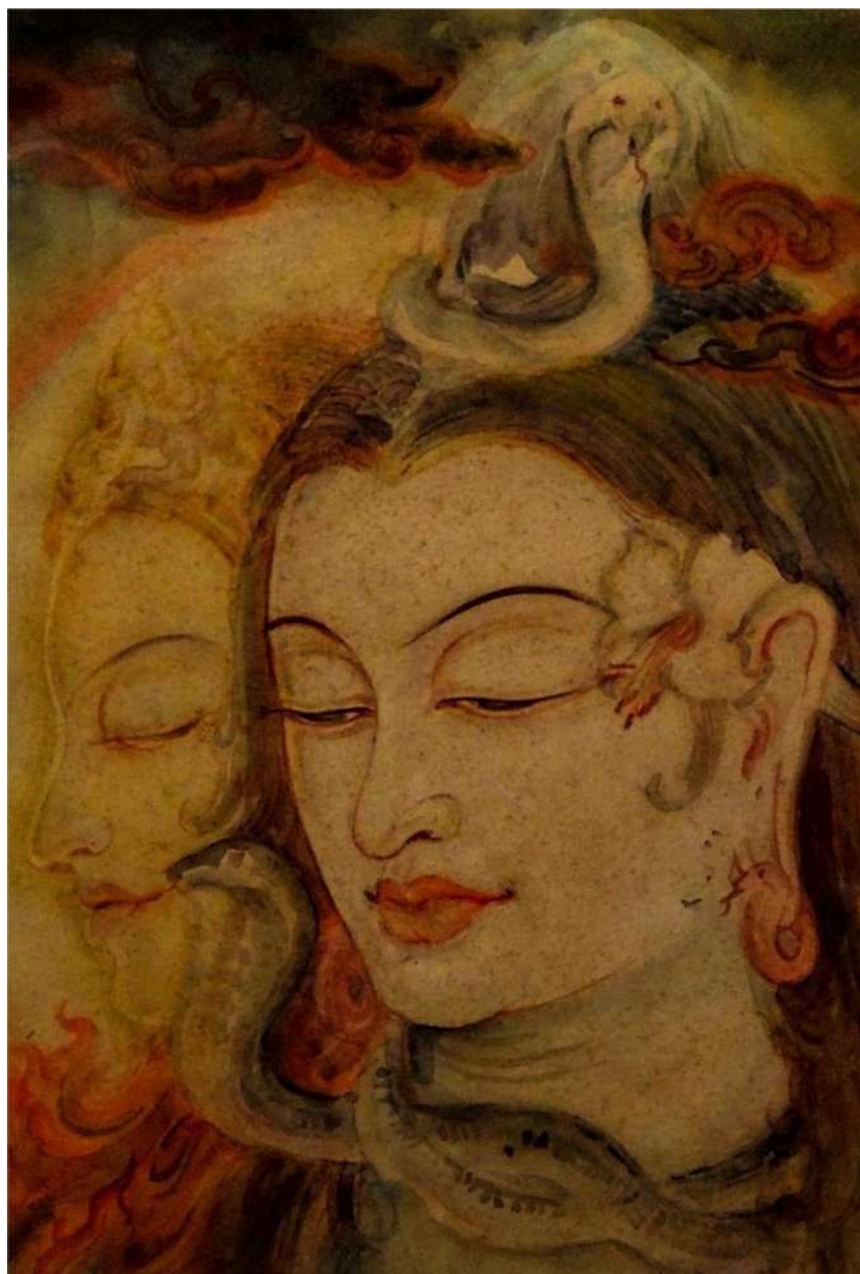
॥২॥

শিবমূর্তির তত্ত্ব :—

শিব যে কে বা কি, তা কে জানতে পারে? স্বয়ং বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা বা ত্রিপাদবিভূতি নারায়ণ তাঁর অনাদিলিঙ্গের উচ্চতা ও গভীরতা মাপতে না পেরে নতি স্বীকার করেছেন। সর্বজ্ঞ মুনিগণ স্বীকার করেছেন 'তব তত্ত্বং ন জানামি', মা সরস্বতী যদি অনন্তকাল ধরে শিবের গুণকীর্তন করেন তবুও তাঁর মহিমার ইয়ত্তা হবে না। প্রজাপতি মহারাজ দক্ষ বিভ্রান্ত হয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলেছেন — শিব কে? উত্তর না পেয়ে তাঁর বিভ্রান্তি মোহে পরিণত হয়েছে। সেই কাহিনী



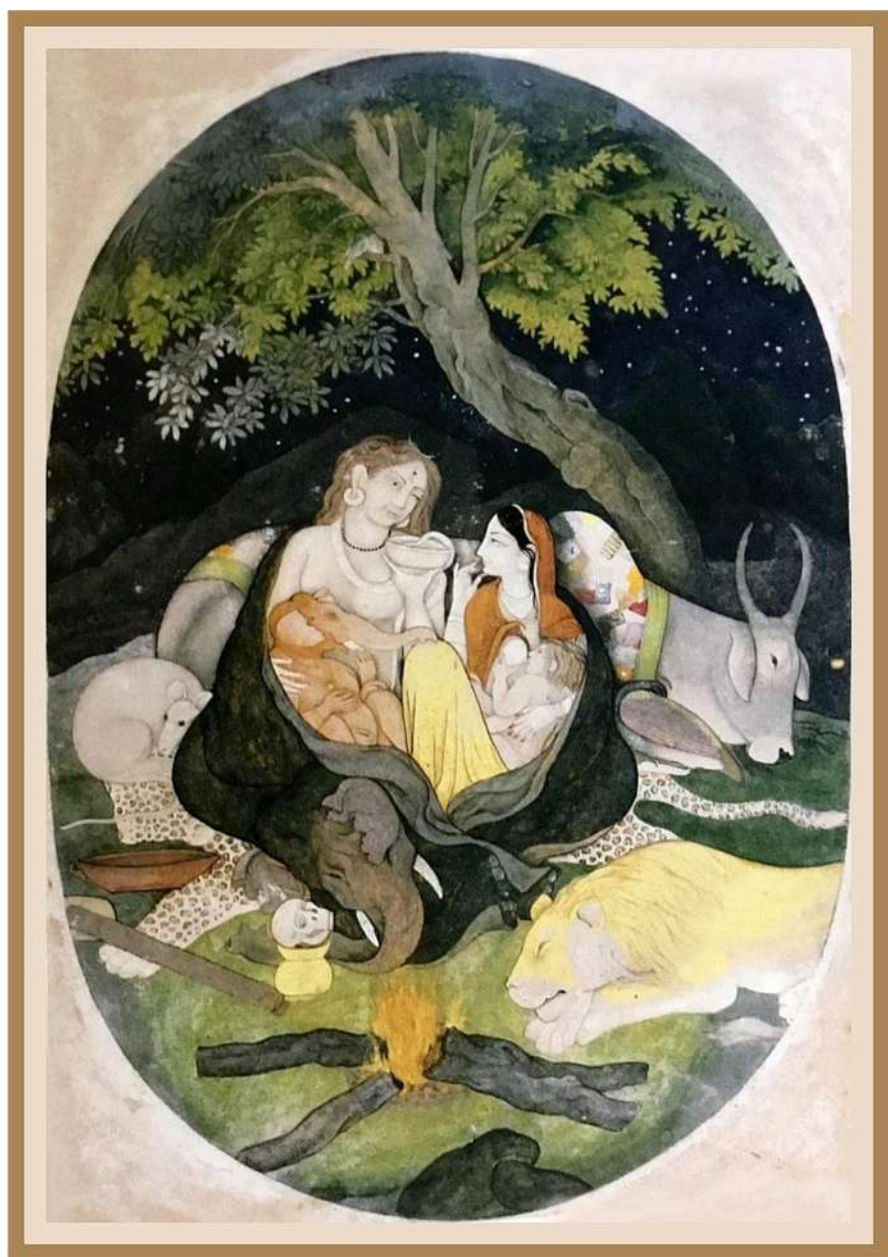
কাশীখণ্ডের উত্তরার্ধে সাতাশীতম অধ্যায়ে এইভাবে বিবৃত হয়েছে যে — মোহাচ্ছন্ন দক্ষ অনেক বিচার করেও বুঝতে পারলেন না শিবের কোন কুলে জন্ম, কি গোত্র, কোথায় বাস, কি স্বভাব, কি বৃত্তি, অথবা তাঁর আচার কেমন। তাঁর বাহন বৃষ, ভোজন বিষ, শৃঙ্গার ভস্ম, সঙ্গী ভূতপ্রেতা শুচিহীনের তপস্যা কোথায়? তিনি ব্রহ্মচারী নন কারণ তিনি বিবাহিত, গৃহস্থ নন কারণ শূশানবাসী, বাণপ্রস্থী নন কারণ কুবেরের ঐশ্বর্যে প্রমত্ত, সন্ন্যাসী নন কারণ অস্ত্রধারী। তাঁকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না কারণ তিনি বেদপাঠ বা যজ্ঞ করেন না, অস্ত্রধারণ দেখে ক্ষত্রিয় মনে হলেও তিনি প্রজারক্ষার বিপরীত প্রলয়প্রিয়, তাঁকে বৈশ্য বলা যায় না কারণ তিনি নির্ধন ও চেষ্টাহীন, তাঁকে শূদ্রও বলা যায় না কারণ তিনি নাগযজ্ঞোপবীতী। তিনি স্ত্রী বা পুরুষ নন কারণ তাঁর মূর্তি অর্ধনারীশ্বর। অথচ তাঁকে নপুংসকও বলা যায় না কারণ তাঁর লিঙ্গ সর্বত্র পূজিত হয়। তাঁকে বালকও বলা যায় না কারণ লোকে বলে তিনি অনাদি, তিনি যুবক





নন কারণ তিনি
বহুবর্ষসম্পন্ন, তিনি বৃদ্ধ
নন কারণ তিনি
জরামরণবর্জিতা
প্রলয়কালে দেবগণকে
বিনাশ করলেও তাঁকে
পাপ স্পর্শ করে না,
আবার ব্রহ্মার পঞ্চমমুণ্ড
ছেদন করায় তিনি
পুণ্যলেশহীন। অস্থি যাঁর
অলংকার, যাঁর পরিধানে
বস্ত্র নেই, সেই জটিল
নিগুণ কুলহীন কর্মভ্রষ্ট
শিবচরিত্রের রহস্য বুঝতে
না পেরে বিভ্রান্ত দক্ষের
মনে প্রবল ক্রোধ উৎপন্ন
হল।

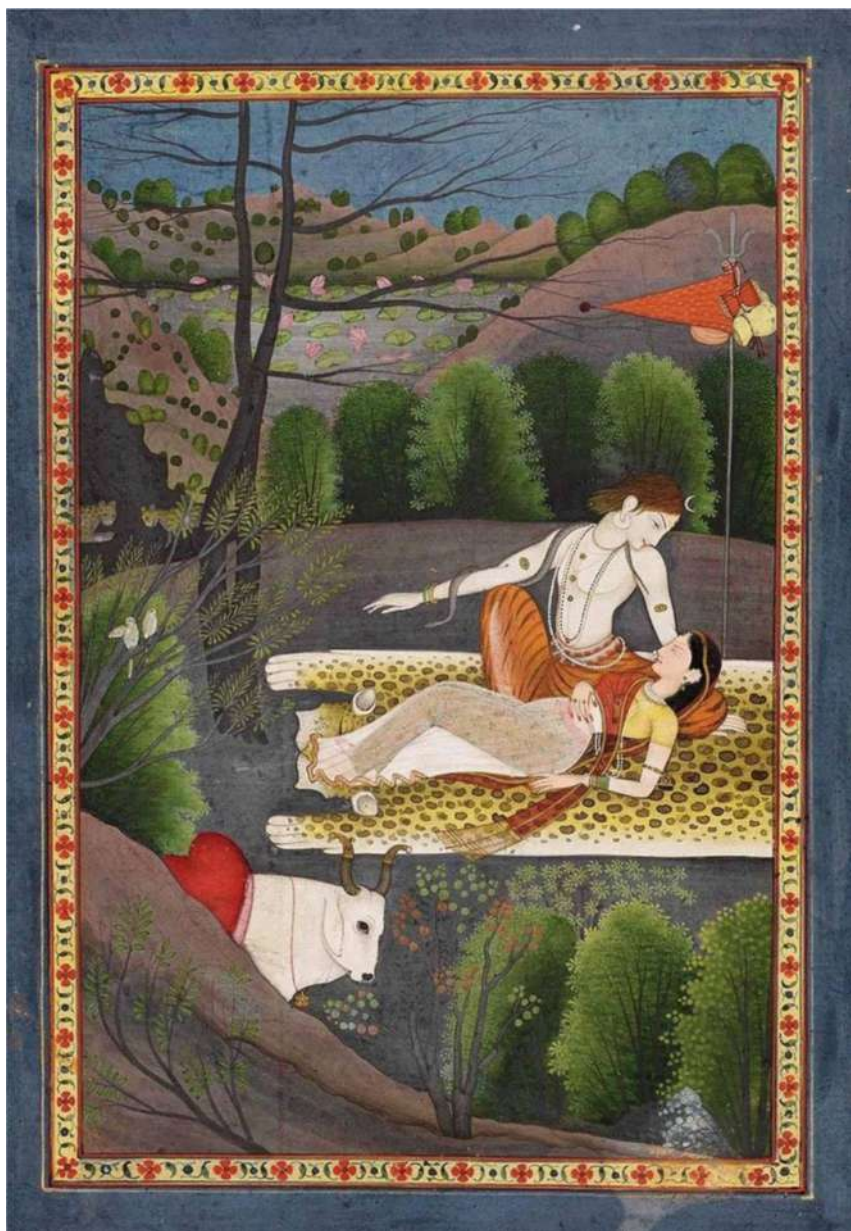
দক্ষ ব্রহ্মার পুত্র, প্রজাপতি ও পরমপ্রাজ্ঞ। তবুও শিবতত্ত্ব সম্পর্কীয় নানা বিভ্রান্তি তাঁর এই প্রশ্নসমূহে জাগরুকা শিবতত্ত্ব জানেন একমাত্র পার্বতী। যেহেতু জ্ঞান গুরুমুখগম্য, তাই কল্যাণকামী ব্যক্তির শিবজ্ঞান কামনায় পার্বতীবাক্য উদ্ধৃত হচ্ছে। বাকি কথা আইকনলজি বা মূর্তিতত্ত্বে বলা হবে। স্কন্দপুরাণের কুমারিকাখণ্ডে পঁচিশতম অধ্যায়ে আছে — পার্বতীকে বিবাহ করার আগে স্বয়ং শিবই ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে পার্বতীকে শিব-সম্পর্কে নানা কটু কথা বলেছিলেন, পার্বতীকে পরীক্ষার জন্য। তার উত্তরেই পার্বতী প্রকাশ করেছেন যোগেশ্বর তথা জগদীশ্বরের স্বরূপ। পার্বতী ছদ্মবেশী শিবকে বললেন — “হে ব্রাহ্মণ! শুনুন, যাতে পাপ মুক্ত হবেন। সেই মহাদেব সমস্ত জগতের আদি, সুতরাং তাঁর বংশবৃত্তান্ত কে জানবে? সমস্ত জগৎই তাঁর রূপ, সুতরাং তিনি উলঙ্গ। তিনি ত্রিগুণাত্মক শূল ধারণ করেন বলে তাকে শূলী বেলো। ভূত সংসারে বদ্ধ নয়, তিনি সেই মুক্ত ভূতগণের পতি। এই সংসারই শ্মশানক্ষেত্র, তিনি প্রার্থীদের প্রতি কৃপাবশতঃ সেই শ্মশানরূপ সংসারে বাস করেন। তাঁর



বিভূতিসকলই প্রকৃত বিভূতিদায়ক, তাই তিনি সেই বিভূতি অঙ্গে মাথেনা ধর্মই বৃষ, তিনি তাতে আরুঢ় বলেই তাঁকে বৃষবাহন বলা হয়। ক্রোধাদি রিপুই সর্প, মহেশ্বর সেই সকল সর্পকেও সম্পূর্ণ বশীভূত করে ভূষণরূপে ধারণ করেন। বিবিধ কর্মসকলই জটাস্বরূপ, তিনি সেই সমস্ত ধারণ করেন। তিন বেদ তাঁর ত্রিনেত্র। তিনগুণময় শরীরই ত্রিপুৰপদবাচ্য, তিনি তা ভস্মসাৎ করেন বলেই তাঁকে ত্রিপুৱারি বলা হয়। যে সকল সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির। এইভাবে মহাদেবকে জ্ঞাত আছেন তাঁরা সেই শিবকেই ভজনা করেন।” ধ্যানেন্নিত্যম্... ইত্যাদি শিবের প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রে বলা হচ্ছে —



‘যিনি রজতগিরিসদৃশ, যিনি সুন্দর চন্দ্রকে ভূষণরূপে ধারণ করেছেন, যাঁর দেহ রত্নালঙ্কার দ্বারা উজ্জ্বল, যিনি চার হাতে কুঠার, মৃগ, বর ও অভয় ধারণ করেন, যিনি প্রসন্ন ও পদ্মাসীন, যাঁর চতুর্দিকে দেবগণ স্তব করছেন, যিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, বিশ্বের আদি, বিশ্বের বীজ, নিখিল ভয়ের হরণকারী, পঞ্চবদন ও ত্রিনেত্র, সেই মহেশকে নিত্য ধ্যান করবো।’ এই ধ্যানের মর্মার্থ — শিবের বপু জ্ঞানময়, যেহেতু জ্ঞান প্রকাশক ও অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশক, তাই শিবশরীর রজতগিরিনিভা চন্দ্রকলা সোম, অমৃত ও স্নিগ্ধতার প্রতীক বলে তা শিবের শিরোভূষণ। যোগজ বিভূতি রত্নবৎ তাঁর দেহে অলঙ্কৃত হয়েছে অথবা মহাকাশবৎ তাঁর সর্বব্যাপী শরীরে জ্যোতিষ্কপুঞ্জ অলংকারের মতো দেদীপ্যমান হয়েছে। তাঁর কর্ম চতুর্দিকে বা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত বলে তিনি চতুর্ভুজ। কুঠার একাধারে বিশ্বকর্মার অস্ত্র বলে তিনিই সৃষ্টিকর্তা, অন্যদিকে তাঁর কুঠার অজ্ঞানারণের ছেদক — ‘মৃত্যুদারুকুঠারিকা’ (ললিতাসহস্রনাম), ‘স্বধিতিবনানাম্’ (মহানারায়ণ উপনিষৎ) [স্বধিতি = কুঠার, বন = অরণ্য]। মৃগ শব্দের একটি





বিশেষ অর্থ পশু, যেহেতু তিনি পশুপতি, তাই তিনি হাতে মৃগ বা স্থিতিতত্ত্ব ধারণ করেছেন; অথবা মৃগমুদ্রা নামক যোগের মুদ্রায় যোগস্থ হয়ে আছেন। তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বরদান করেন তাই বরদাতা। ভক্তকে বিপদে রক্ষা করেন বলে অভয়মুদ্রা ধারণ করেছেন। তিনি সর্বদা সমাধিযোগে প্রসন্ন ও পদ্মাসনে উপবিষ্ট। ইন্দ্রিয়সমূহ প্রকাশক বলে দেবপদবাচ্য, ইন্দ্রিয়গণ চতুর্দিক থেকে আত্মাকে ভোগ্যবিষয় প্রদান করে, শিবই দেহস্থ পরমাত্মা, তাই সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ দেবগণ চতুর্দিকে তাঁর স্তব গাইছেন। বাঘ হিংস্র পশু, তিনি দুর্দমনীয় পশুভাবকে দমন

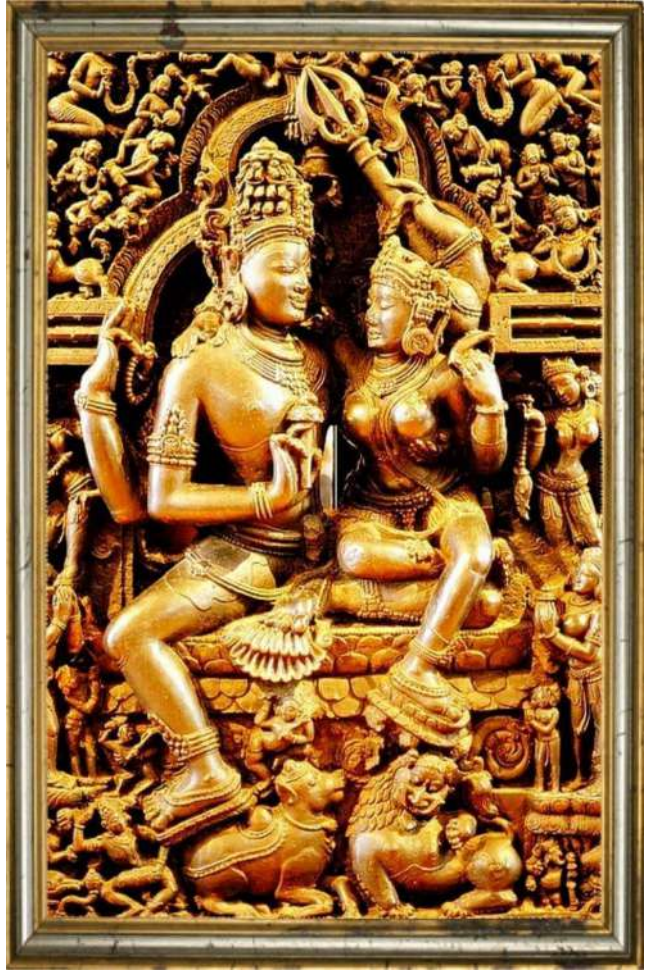
করে ব্যাঘ্রচর্ম করে পরেছেন। প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রে ডমরু-ত্রিশূলের উল্লেখ না থাকলেও তার ব্যাঘ্রা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁর ডমরু বৈরাগ্যের প্রতীক, ডমরুধ্বনিই শব্দব্রহ্ম — যা থেকে বর্ণমালা ও ব্যাকরণশাস্ত্র বিকশিত হয়েছে। ত্রিশূলের তিন ফলাই তিনগুণ, সত্ত্ব-রজঃ-তমো এই ত্রিগুণ যখন সাম্যাবস্থায় আসে, তখন ব্রহ্মভাব ব্যক্ত হয়, তাই তাঁর ত্রিশূল শিবকোষের চাবিকাঠি — “রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈতত্ত্রিশূলং ত্রিগুণাত্মিকম্। তসৈব শিবকোষস্য কুঞ্চিকা কথিতা বুধৈঃ॥” তিনি পঞ্চবদন। তাঁর পূর্বমুখের নাম তৎপুরুষ, এই মুখ ঐন্দ্রি, পীতবর্ণ, সৃষ্টিকার্যে নিরতা। পশ্চিমমুখের নাম সদ্যোজাত, এই মুখ বারুণী, শুক্লবর্ণ, স্থিতিকারী। দক্ষিণ মুখের নাম অঘোর, এই মুখ যাম্য, মেঘবর্ণ, সংহারকর্মে ব্যাপ্ত। উত্তরমুখের নাম বামদেব, এই মুখ কৌবের, রক্তবর্ণ, বিনিগ্রহ ও অনুগ্রহে নিরতা। উর্ধ্বমুখ ঈশান শুদ্ধ, উপাধিশূন্য, নিশ্চল, মোক্ষদায়ক। শাস্ত্রান্তরে শিবের পঞ্চবদন বিষয়ে বর্ণনাভেদ আছে।



॥৩॥

‘শিব’ নামের অর্থ:—

শিবপুরাণে উক্ত হয়েছে
“শং নিত্যসুখম্ আনন্দম্
ইকারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥
বকারঃ শক্তিরমৃতং
মেলনং শিব উচ্যতো
তস্মাদেবং স্বমাত্মানং
শিবং কৃত্বার্চয়েচ্ছিবমা॥”
— অর্থাৎ, ‘শিব’ শব্দে
‘শ’-কার নিত্য সুখ ও
আনন্দস্বরূপ, ‘ই’-কার
পরমপুরুষ, ‘ব’-কার
অমৃতশক্তি। সুতরাং শিব
শব্দে ‘শ’-কার সুখস্বরূপ
সমাধিবাচক হওয়ায়
আধ্যাত্মিক তাপনিবারক,
‘ই’-কার অভিষ্টপূরক
হওয়ায় আধিভৌতিক
তাপনিবারক, ‘ব’-কার
অমৃতবীজ ও বরুণ-



অধিদৈবহেতু আধিদৈবিক তাপনিবারক। এইভাবে ‘শিব’-নাম ত্রিতাপনাশক।

অন্যমতে ‘শব’ শব্দের ‘শ’-এ ‘ই’কার যুক্ত হয়ে ‘শিব’ হয়েছে, ‘ই’কার প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি, প্রকৃতিবিহীন শিব শব্দমাত্র। শিব মানে মঙ্গল, যিনি মঙ্গলবিধায়ক তিনিই শিবা শিবের কত নাম! তিনি সর্ববৃহৎ বলে ব্রহ্ম, সনাতন বা স্থির বলে স্থাণু, ষড়ৈশ্বর্যশালী বলে ভগবান, সর্বভূতকে কলন বা সংহার করেন বলে মহাকাল, স্বয়ংজাত বলে স্বয়ম্ভু, পশু বা জীবের বন্ধন ও মোচনকর্তা বলে পশুপতি, মহৈশ্বর্যবান বলে মহেশ্বর, দাক্ষিণ্য বা কৃপাহেতু দক্ষিণামূর্তি ইত্যাদি।





॥৪॥

সন্ন্যাসী ও গৃহীর আদর্শ শিব :—

“সদাশিব সমারম্ভাং
শঙ্করাচার্য্য মধ্যমাম্
অস্মদাচার্য্যপর্যন্তাং বন্দে
গুরুপরম্পরাম্॥” — এই
পরম্পরা বন্দনার মন্ত্র
থেকে আমরা বুঝি স্বয়ং
সদাশিবই সন্ন্যাসীর
আদিগুরু। সন্ন্যাসীর সকল
আদর্শই শিবের মধ্যে
পরিষ্কৃত — তাঁর বৈরাগ্য,
সর্বদা যোগে স্থিতি,
জ্ঞানশক্তি, শুচি-
অশুচিতার মতো সকল
বিপরীত অবস্থার মধ্যেও
স্থির থাকা ইত্যাদি।
অন্যদিকে গৃহস্থের
আদর্শও তিনি শিবের

সংসার বিদ্যার সংসার, কৈলাস একাধারে গৃহ ও তপোবন উভয়ই। সংসারী মানুষের মধ্যে
যত শ্রেষ্ঠতম গুণাবলী দেখা যায়, তার গুরু তিনিই। তিনি নৃত্য-গীত-বাদ্যের দেবতা, তিনি
সংস্কৃত ব্যাকরণের জনক, চিকিৎসাশাস্ত্র, অস্ত্রবিদ্যার, তন্ত্র-মন্ত্র-হঠযোগের গুরু। তিনি
নিজেই প্রেমাভক্তির পরাকাষ্ঠা ও শরণাগতের আশ্রয়দাতা, তাঁর এই দুই গুণ গৃহস্থের
সর্বোচ্চ আদর্শ। সন্ন্যাসীর জ্ঞান ও গৃহীর ভক্তি শিবচরিত্রে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।
সনাতন ভারতবর্ষের সকল আদর্শ, সকল জ্ঞান ও সকল বিদ্যার তিনিই স্বয়ং সাকার বিগ্রহ।

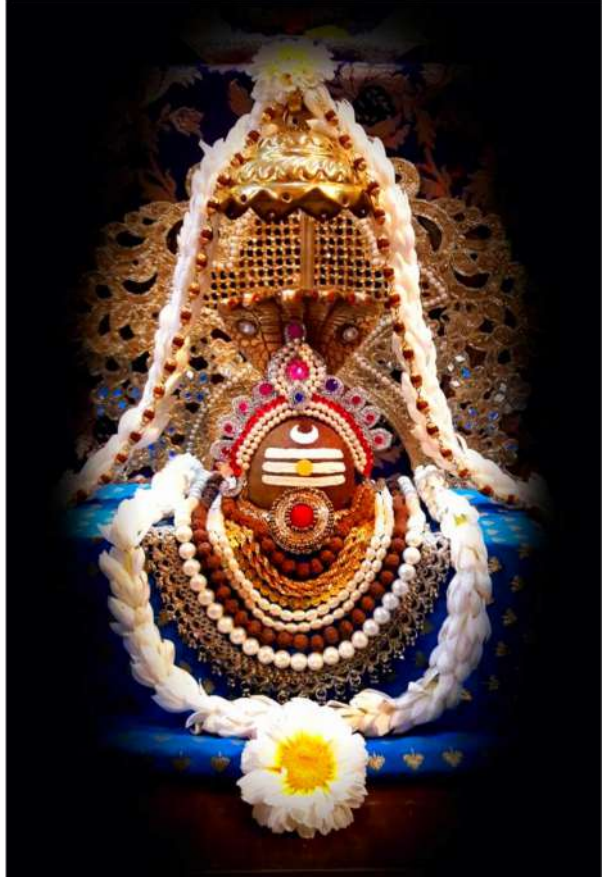


॥५॥

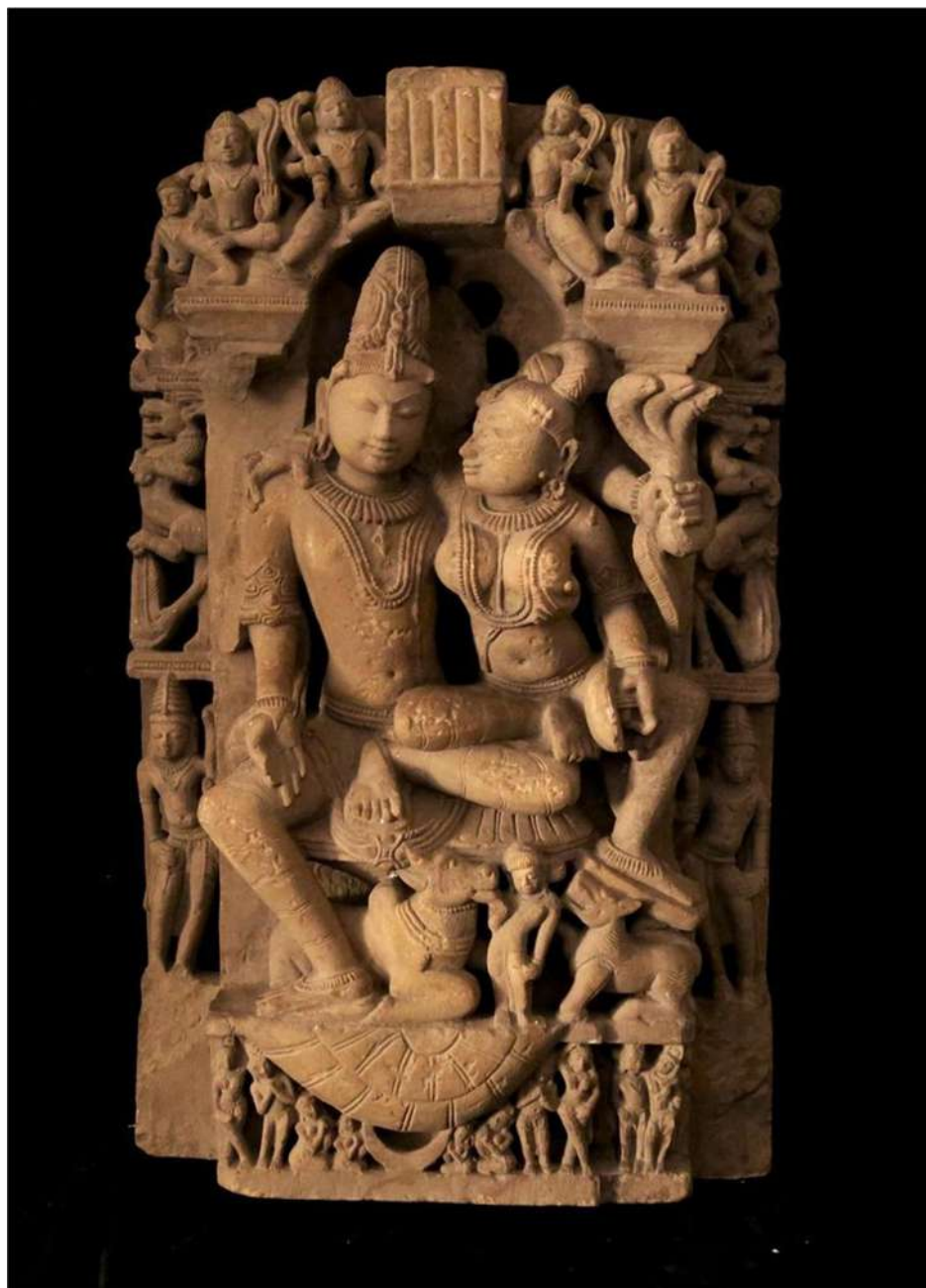
শিবলিঙ্গ কি? :—

জ্ঞানীর দৃষ্টিতে শিবলিঙ্গ
নিরাকার ব্রহ্মের প্রতীক,
বৈদিকের দৃষ্টিতে যুগস্তুভ,
যাজ্ঞিকের দৃষ্টিতে
সপীঠশিবলিঙ্গ বেদীর উপর
হোমশিখা, পিতৃ উপাসকের
দৃষ্টিতে পিতৃমাতৃচিহ্ন,
কৃষকের দৃষ্টিতে উর্বরতার
প্রতীক, পশুপালকের দৃষ্টিতে
প্রজননশক্তি, আসুর
জনজাতির দৃষ্টিতে শিশুদেব,
বৌদ্ধের দৃষ্টিতে স্তূপ... আরও
কত কি!

‘লিঙ্গ’-এর ‘লী’ শব্দে লয়
পাওয়া ও ‘গম’ শব্দ বহির্গত
হওয়া। তাই কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে
(৩/১০) বলা হয়েছে —



“যস্যেচ্ছয়া ভবেৎ সৃষ্টির্লয়ন্তুত্রৈব গচ্ছতি। তেন লিঙ্গন্তু বিখ্যাতং যত্র লীনং চরাচরমা।”
অর্থাৎ, ‘যে পরম কারণের ইচ্ছায় এ জগতের উৎপত্তি ও যাতে এ জগতের লয়, সেই
লিঙ্গমধ্যেই চরাচর জগত ওতপ্রোত হয়ে আছে।’ স্থূলদৃষ্টিতে শিবলিঙ্গের দুটি অংশ — লিঙ্গ
ও বেদী। লিঙ্গভাগ শিবস্বরূপ এবং বেদী আদ্যাশক্তির প্রতীক। বেদীভাগ — গৌরীপট্ট,
গৌরীপীঠ, যোনিপীঠ ইত্যাদি নামে সুপরিচিত। স্কন্দপুরাণমতে — “আকাশং লিঙ্গমিত্যাহঃ
পৃথিবী তস্য পীঠিকা। আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতো।” অর্থাৎ, ‘আকাশরূপ লিঙ্গের
বেদী পৃথিবী, যেখানে সকল দেবতার নিবাস, সেখানে সব কিছু লয় হয় বলে তাঁকে লিঙ্গ
বলো।’ রুদ্রাধ্যায়ের ধ্যানমন্ত্রে সর্বব্যাপী বিরাট দিব্যালিঙ্গের লক্ষণ অপূর্ব ভঙ্গীতে প্রকাশিত
হয়েছে — “পীঠং যস্য ধরিত্রী জলধরকলসং লিঙ্গমাকাশমূর্তিঃ, নক্ষত্রং পুষ্পমালাং

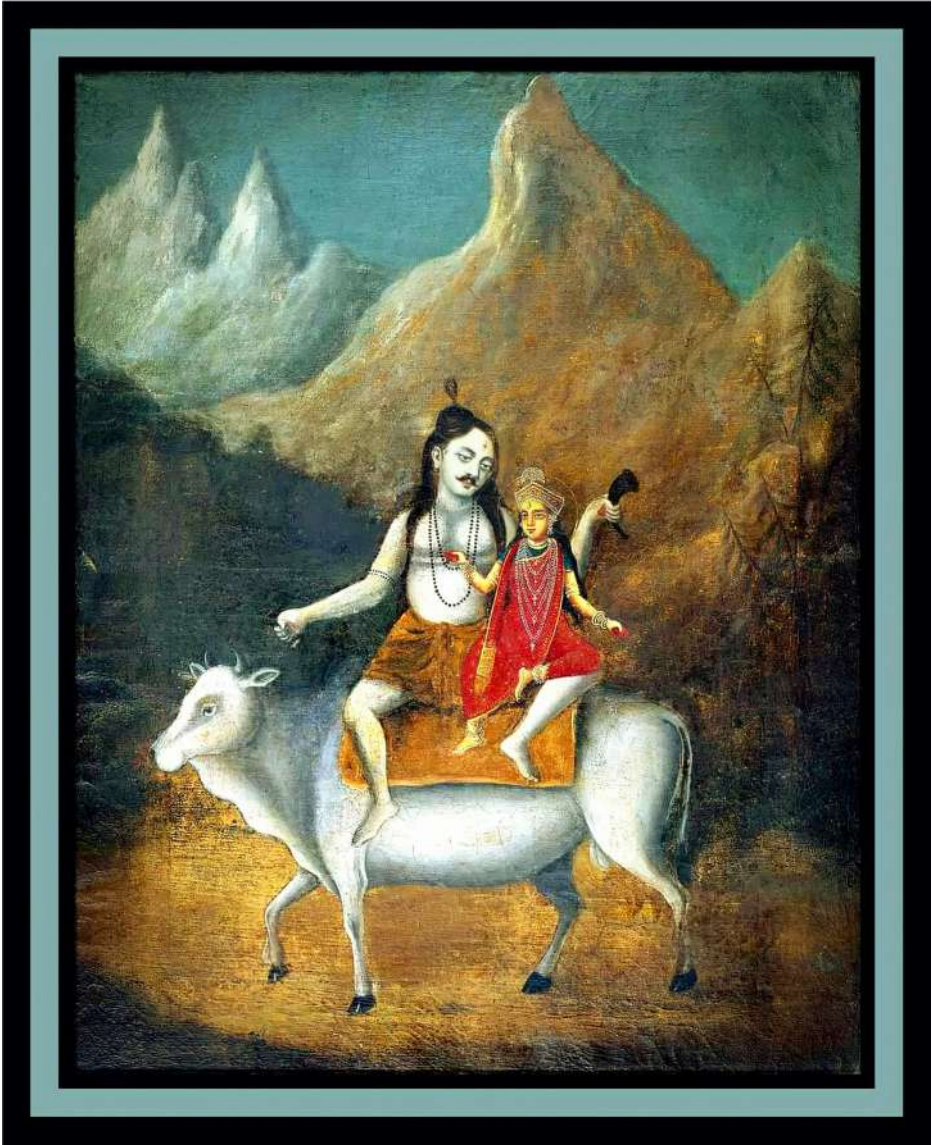




গ্রহগণকুসুমং

চন্দ্রবহ্ন্যর্কনেত্রম্। কুক্ষিঃ
সপ্তসমুদ্রং ভুজগিরিশিখরং
সপ্তপাতালপাদং, বেদং বক্ত্রং
ষড়ঙ্গং দশদিশ বসনং
দিব্যালিঙ্গং নমামি।” অর্থাৎ,
‘আমি সেই দিব্যশিবলিঙ্গকে
প্রণাম করি, স্বয়ং ধরিত্রী যাঁর
গৌরীপীঠ, মেঘমালা যাঁর
জলাভিষেকের কলস,
মহাকাশ যাঁর বিরাট লিঙ্গরূপ,
তারকাবলী মাল্য, গ্রহগণ
পূজাকুসুম, চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি
যাঁর ত্রিনয়ন, সপ্তসমুদ্র
উদরদেশ, পর্বতশিখর যাঁর
বাহু, সপ্তপাতাল চরণ,
ষড়ঙ্গবেদ যাঁর মুখ, তিনি
দিগ্বসনা।’ — এই ধ্যানমন্ত্রে

শিবলিঙ্গের মহিমা শিবলিঙ্গের সকল অর্বাচীন যৌনব্যাখ্যাকে অতিক্রম করে অদ্বৈত
বেদান্তের শিখরচূড়া স্পর্শ করেছে। লিঙ্গপুরাণ মতে (১৭ অধ্যায়) — “প্রধানং লিঙ্গমাখ্যাং
লিঙ্গী চ পরমেশ্বরঃ।” অর্থাৎ, প্রকৃতিই লিঙ্গ এবং মহেশ্বরই লিঙ্গী। এইভাবে পরমপুরুষ ও
পরাপ্রকৃতি কখনই বিচ্ছিন্ন থাকেন না। “পীঠাকৃতিরুমাদেবী লিঙ্গরূপশচ শঙ্করঃ।” — অর্থাৎ,
উমাদেবী লিঙ্গপীঠ এবং শঙ্কর লিঙ্গরূপা (লি. পু. উত্তর ১১/৩১)। অনুরূপ বচন
নারদপাঞ্চরাত্রেও পাওয়া যায় — “যত্র লিঙ্গস্তত্র যোনিঃ যত্র যোনিস্ততঃ শিবঃ।” অর্থাৎ,
যেখানেই লিঙ্গ (শিব) সেখানেই যোনি (শক্তি), উভয় অবিচ্ছেদ্য। শিবলিঙ্গের এই যে
সর্বগ্রাসী, সর্বলয়কারী, সর্বাশ্রয়দাতা বিরাট বিপুল রূপ, তা আমাদের ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত ও
মুগ্ধ করে। “সর্বলিঙ্গময়ো লোকঃ সর্বং লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিতম্।” অর্থাৎ, ‘সর্ব জগৎ লিঙ্গময়,
লিঙ্গেই সব অধিষ্ঠিত’ (লি. পু. — ১/৭৩/৬)। ‘দেব, দৈত্য, দানব, যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ,





রাক্ষস, পিতৃগণ, মুনি, ঋষি, কিন্নর সকলেই যে শিবলিঙ্গের পূজায় সিদ্ধিলাভ করেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই’ (ঐ — ১/৭৩/৭-৯)। প্রস্তর, রত্ন, ধাতু, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানে শিবলিঙ্গ গঠিত হয়। রত্নলিঙ্গ পূজায় শ্রীলাভ, প্রস্তরলিঙ্গে সর্বসিদ্ধি, ধাতবলিঙ্গে ধনলাভ, কাষ্ঠলিঙ্গে ভোগ ও সিদ্ধি, মৃন্ময়লিঙ্গ সর্বসিদ্ধিদায়ক ও শুভ। শিবলিঙ্গের নিম্নভাগে ব্রহ্মা, মধ্যভাগে বিষ্ণু ও উর্ধ্বভাগে রুদ্র বিরাজিত। লিঙ্গবেদী বা গৌরীপীঠে আদ্যাশক্তি ও সর্বাঙ্গে সর্বদেবদেবীর নিবাস। যিনি গৌরীপীঠে শিবলিঙ্গ পূজা করেন, তাঁর সর্ব দেবদেবী পূজার ফললাভ হয়।

॥৬॥

শিব ও শিবলিঙ্গের সম্পর্ক :—

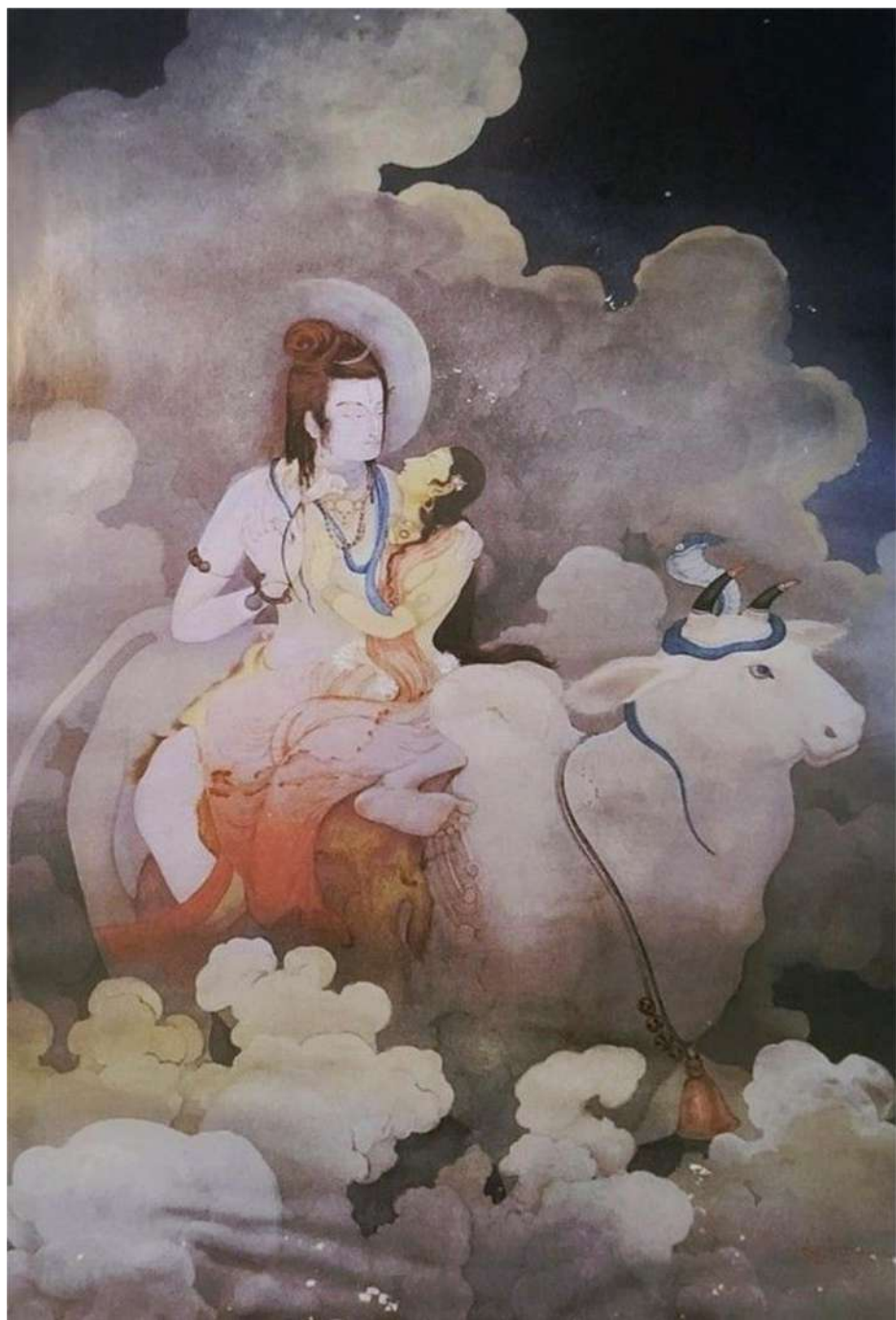
স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে — “শিবলিঙ্গ-পূজার উৎপত্তি অথর্ববেদসংহিতার যূপ-স্তম্ভের প্রসিদ্ধ স্তোত্র হইতো। উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা স্কন্ধের বর্ণনা আছে এবং উক্ত স্কন্ধই যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যজ্ঞের অগ্নি, শিখা, ধূম, ভস্ম, সোমলতা ও যজ্ঞকাষ্ঠের বাহক বৃষ যে প্রকার মহাদেবের অঙ্গকান্তি, পিঙ্গল জটা, নীলকণ্ঠ, ও



বাহনাদিতে পরিণত
হইয়াছে, সেই প্রকার
যূপ-স্ফুটও শ্রীশঙ্করে
লীন হইয়া মহিমান্বিত
হইয়াছো” স্বামীজীর
মতে — “শিবলিঙ্গ
সম্বন্ধে যৌনব্যাখ্যা
ভারতবর্ষে অতি
অর্বাচীন এবং উক্ত
বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ঘোর
অবনতির সময় সংঘটিত
হয়।” স্বামীজীর দ্বারা
উক্ত শিবলিঙ্গের যৌন
ব্যাখ্যার আভাস পাওয়া
যায় ঋষিদের অভিশাপে
শিবের দারুবনে
লিঙ্গত্যাগের কাহিনীতে।
যদিও বিভিন্ন পুরাণে এই
ঘটনার বিবরণ স্থান-
কাল-পাত্রের নিরিখে



বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে, তবুও বোঝা যায় শিশ্নোপাসক সম্প্রদায়সমূহ নিজেদের
ইষ্টসত্ত্বা ধীরে ধীরে শিবলিঙ্গের নিরাকারসত্ত্বায় বিলীন করছিল। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে,
দক্ষযজ্ঞ শিবহীন যজ্ঞরূপে প্রচারিত হলেও দক্ষযজ্ঞে একাদশ রুদ্রগণ হবিঃভোজন
করেছিলেন। তবে কি বৈদিক রুদ্রগণের পূজায় শিবপূজা হয় না? শান্তিপর্বে দক্ষ বলছেন
যে, জটামুকুট ও শূলধারী একাদশ রুদ্রকে জানি, কিন্তু মহেশ্বর কে আমি তা বুঝি না। (‘সন্তি
নো বহুবো রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দিনঃ। একাদশ স্থানগতাঃ নাহং বেদ্বি মহেশ্বরম্’।) এইখানে
দধীচীমুনি মহেশ্বরকেই স্রষ্টা, পশুপতি, জগতের প্রভু এবং প্রকৃত যজ্ঞভোক্তা বলে ব্যাখ্যা
করছেন।





এইসব উপাখ্যান দেখে মনে হয় স্বামীজীর কথাই সারকথা। ধীরে ধীরে শিবের সাথে জড়িত সকল উপাস্যচিহ্ন শিব তথা শিবলিঙ্গে মিলেমিশে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিদ্যেশ্বর-সংহিতায় পাই — ‘যেমন ব্রহ্ম নিগুণ ও সগুণভেদে উভয়প্রকার, তেমনি নিষ্কলশিব নিরাকার-লিঙ্গরূপী এবং সগুণশিব সাকার-রূপধারী’ স্বভাবতঃ সাকার উপাসনার থেকে নিরাকার উপাসনা কঠিন, তাই যাঁরা মূর্তিতে উপাসনা করেন তাঁদের থেকে যাঁরা শিবলিঙ্গে উপাসনা করেন, তাঁরা অধিক ফললাভ করেন। এ বিষয়ে মহাভারতের কাহিনী সুপ্রসিদ্ধ — ‘অর্জুন ও অশ্বখামা উভয়েই বীরত্বে সমান পারদর্শী হলেও অশ্বখামার ব্রহ্মাস্ত্র অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্রের কাছে ব্যর্থ

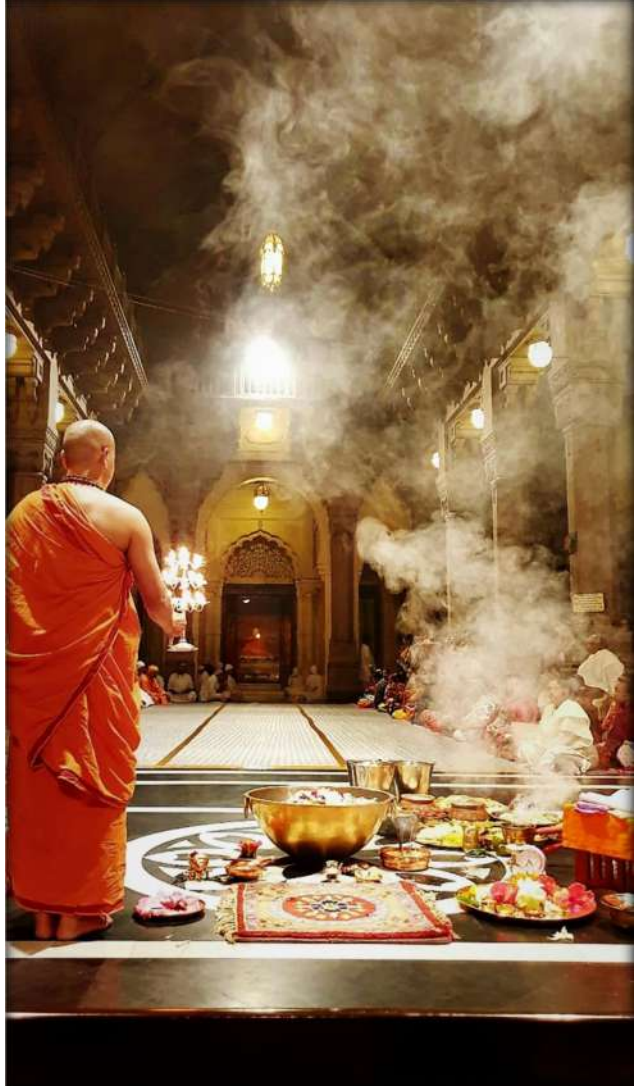
হলো কেন?’ — এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে ব্যাসদেব উত্তর দিয়েছিলেন — ‘জন্মান্তরে অর্জুন শিবলিঙ্গে এবং অশ্বখামা শিবের প্রতিমায় অর্চনা করে বরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেহেতু প্রতিমাপেক্ষা শিবলিঙ্গের অর্চনায় ফল অধিক, তাই উভয়েই ব্রহ্মাস্ত্রবিং হলেও অর্জুন শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন হয়েছিলেন।’



॥৭॥

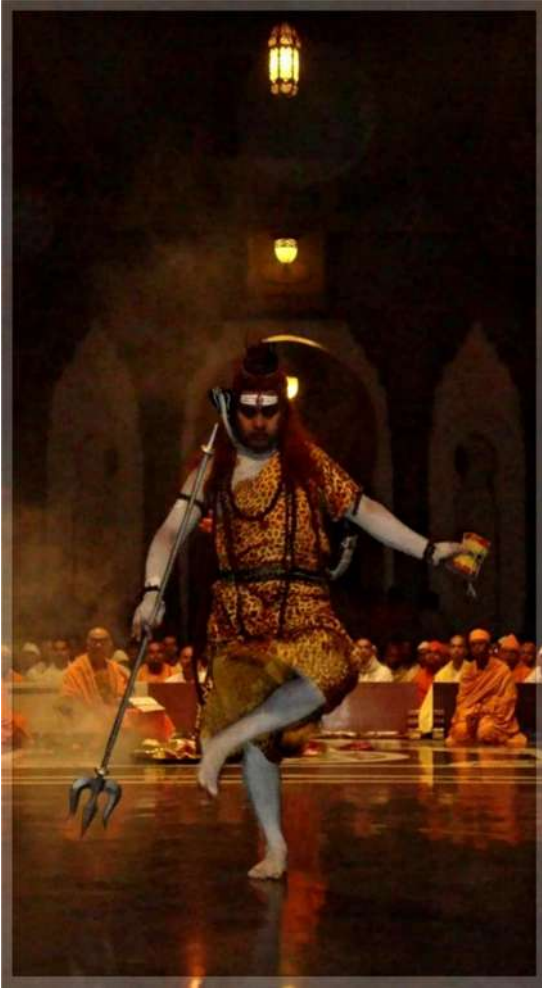
শিবরাত্রি-ব্রত :—

ঈশানসংহিতা মতে সৃষ্টির
আদিতে মুখ্যমাঘ (বা
গৌণফাল্গুন একই —
রঘুনন্দন) মাসের
কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর
নিশাকালে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর
সন্মুখে জ্যোতির্ময়
অনাদিলিঙ্গের আবির্ভাব
ঘটেছিল। ওই আদি
স্বয়ম্ভুলিঙ্গের প্রথম পূজক
ছিলেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু।
সেই থেকেই শিবরাত্রির
আরম্ভ। প্রতিমাসের
কৃষ্ণাচতুর্দশী মাসিক
শিবরাত্রি ও ফাল্গুনের
কৃষ্ণাচতুর্দশী মহাশিবরাত্রি
বলে প্রচলিত।
অগ্নিপুராণমতে
দক্ষযজ্ঞের পর দেবতারা
কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতিথি
মহাদেবের পূজার জন্য



ধার্য করেছিলেন। সাধারণ লোকবিশ্বাস অনুযায়ী এই তিথিতেই হরপার্বতীর বিবাহ হয়েছিল, এই তিথিতে শিব ব্রহ্মার পঞ্চমমুণ্ড ছেদন করেছিলেন, এই তিথিতে শিব তাণ্ডবনৃত্যের আরম্ভ করেছিলেন, এই তিথিতেই শিব বিষপান করে জগতরক্ষা করেছিলেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন মতান্তর আছে। যেহেতু শিব যজ্ঞের প্রথম যজ্ঞভাগাধিকারী এবং শিববিহীন যেকোন দেবপূজা দক্ষযজ্ঞের মত নিন্দনীয়, তাই শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি সকল





সম্প্রদায়ের সাধকদের জন্যেই শিবরাত্রি-ব্রত অবশ্যই পালনীয়; (“শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি যো বা স্যাদন্যপূজকঃ। সর্বং পূজাফলং হন্তি শিবরাত্রিবহির্মুখঃ।” — ঈশানসংহিতা)। কালমাধবীয়ে শিব বলেছেন — “শিবরাত্রিতে স্নান, বস্ত্র, ধূপ, পুষ্প বা অর্চনার দ্বারা আমি যত না প্রীত হই, তার চেয়ে বেশী প্রীত হই উপবাসপালনো” মহাদেবের প্রীতির জন্য শিবরাত্রিতে চার প্রহরের চারবার পূজা, রাত্রি জাগরণ ও উপবাসবিধি পালন কর্তব্য। প্রথম প্রহরে দুধ, দ্বিতীয় প্রহরে দই, তৃতীয় প্রহরে ঘি এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা শিবকে স্নান করানো হয়। প্রতিবার স্নানের পর গঙ্গাজল দিয়ে শিবলিঙ্গকে পুনঃস্নান করানোর নিয়ম। স্কান্দে নাগরখণ্ডে বলা হয়েছে — “শিবরাত্রিতে মানুষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপবাসে, জাগরণে

এবং শিবলিঙ্গের পূজায় অক্ষয় লোকসকল লাভ করে এবং অশ্তে শিবসায়ুজ্য প্রাপ্ত হয়।” পদ্মপুরাণ বলছে — “পুরুষ এবং পতিব্রতা রমণীগণ শিবরাত্রির দিন ভক্তিপূর্বক মহাদেবের পূজা করবো” ঈশান সংহিতায় বলা হচ্ছে — “এইভাবে যদি কোন মানুষ বারো বা চব্বিশ বছর ধরে এই ব্রত করেন, তবে তিনি ইহলোক ও পরলোকে সকল অভীষ্ট লাভ করেনা” উত্তরাভি মুখে বসে শিবপূজা করতে হয়। শিবের প্রিয় পুষ্প আকন্দ, ধুতুরা এবং প্রিয় ফল বেলা ভবিষ্যপুরাণ মতে — “যে মানুষ অখণ্ড বিশ্বপত্র দ্বারা একবারমাত্র শিবলিঙ্গের অর্চনা করে সে সর্বপাপ মুক্ত হয়ে সসম্মানে শিবলোকে বাস করে।



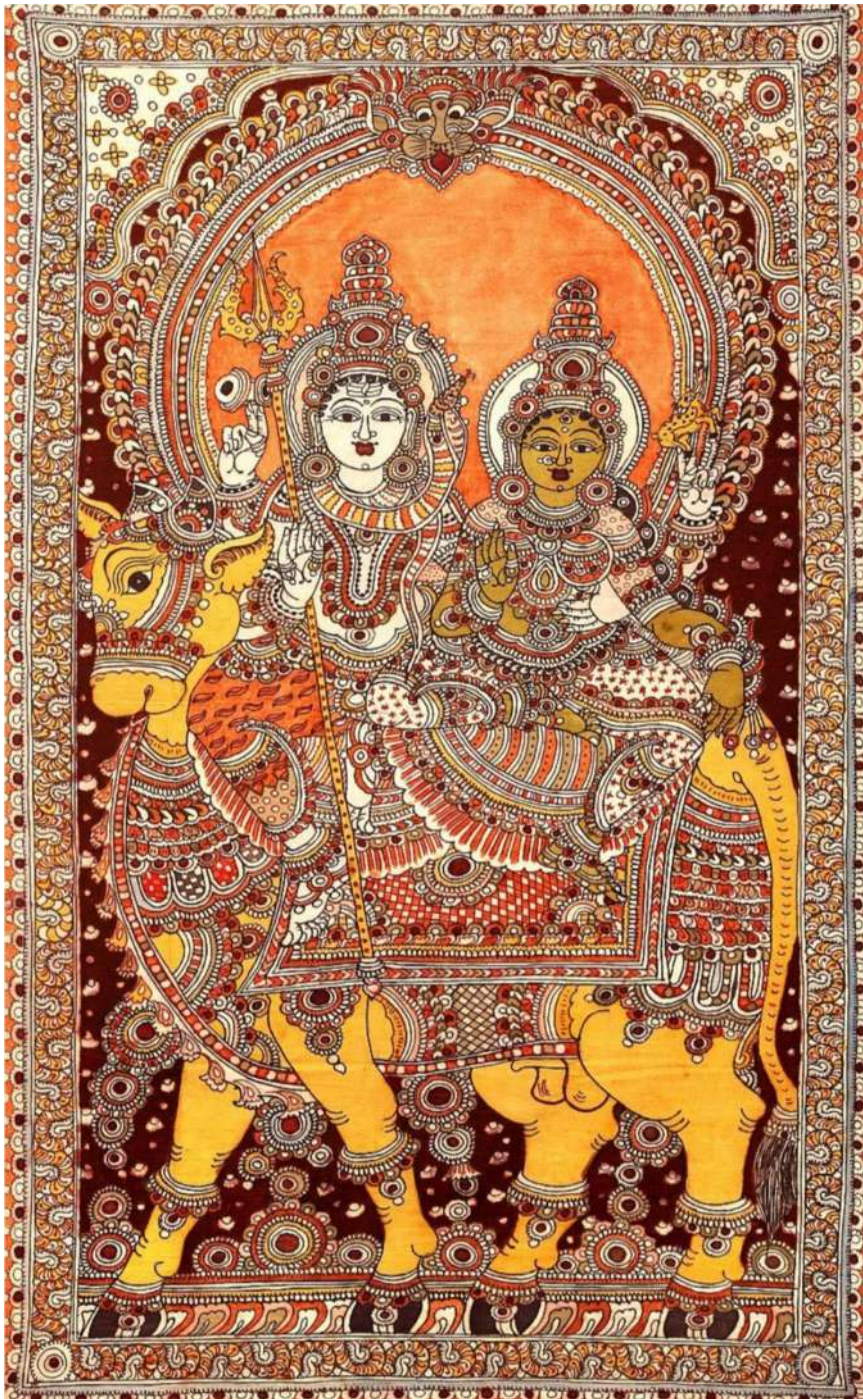
বিল্বপত্রের অর্পণে সকল কামনা পূরণ ও দারিদ্র্য নাশ হয়। যে ব্যক্তি শিবলিঙ্গে ধুরা ফুল অর্পণ করে সে লক্ষ গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি”

শিবরাত্রি-ব্রতে শিব পরম প্রীত হন। এই তিথিতে উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করে জল ও বেলপাতায় শিবপূজা করতে হয়। শিবপূজার সময় রুদ্রাক্ষ ও ভস্মের ত্রিপুঞ্জ ধারণ করতে হয়।

এইসব বিধি-বিধানের কিছু অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। উপবাস মানে ‘সমীপে বাস করা’ অর্থাৎ ঈশ্বরীয় ভাবে অতিবাহিত করা, আমরা ইন্দ্রিয়পথে যে বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করি তা-ই আহার — ‘আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ’, ইন্দ্রিয়সমূহের বাহ্যবিষয়ের অগ্রহনই অনাহার। চতুর্থ বা তুরীয়াবস্থা জীবের পক্ষে অজ্ঞাত হওয়ায় তা রাত্রিস্বরূপ, জ্ঞানীর পক্ষে তুরীয়াবস্থায় স্থিতিই



রাত্রিজাগরণ, তাই রাতজাগার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো শিবোহম্ জ্ঞানে জেগে থাকা। শিবপূজায় রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে হয় কেন? ত্রিপুরাসুর বধের সময়ে মহাদেব ধনুকবাণে দৃষ্টি একাগ্র করে দশহাজার বছর অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকার ফলে তাঁর দুই চোখ থেকে যে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ে, তাই রুদ্রাক্ষে পরিণত হয়। রুদ্রাক্ষ সেই অর্থে শিবের প্রতিমূর্তি, পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ শিবেরই পঞ্চবদনের প্রতীক। কথিত আছে রুদ্রাক্ষ বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম হয় না, তাই রুদ্রাক্ষ ধারণের তাৎপর্য — এই সংসারে ফিরে আসার কারণ অজ্ঞান-অঙ্কুর যেন আর উৎপন্ন না হয়। ভস্ম মেখে শিবপূজা করতে হয়। ভস্ম বৈরাগ্যের প্রতীক, কেননা এই সংসারের প্রতিটি বস্তুই প্রলয়কালে বিনষ্ট হয়ে ভস্মে পরিণত হয়। ভস্মজাবালোপনিষদ বলছে — “স্থল, জল, অনল, অনিল, গগন সবই ভস্ম, দেব-মুনি-ঋষি সমস্ত কিছু এই





ভস্মেরই বিকারা” (“অগ্নিরিতি
ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম জলমিতি
ভস্ম স্থলমিতি ভস্ম ব্যোমেতি
ভস্ম দেবা ভস্ম ঋষয়ো ভস্ম।
সর্বং হ বা এতদিদং ভস্মা” —
ভস্মজাবালোপনিষদ)। স্থূল,
সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন শরীর
ভস্মে পরিণত হলে তবেই
মুক্তি, তাই ভস্মাঙ্কিত
সমান্তরাল ত্রিরেখাই
জীবন্মুক্তির পরিচায়ক। এই
হলো প্রকৃত শিবরাত্রি-ব্রত
পালনের গুঢ় তাৎপর্য।

॥৮॥

সৃষ্টিতত্ত্ব ও আদি-শিবরাত্রি :—

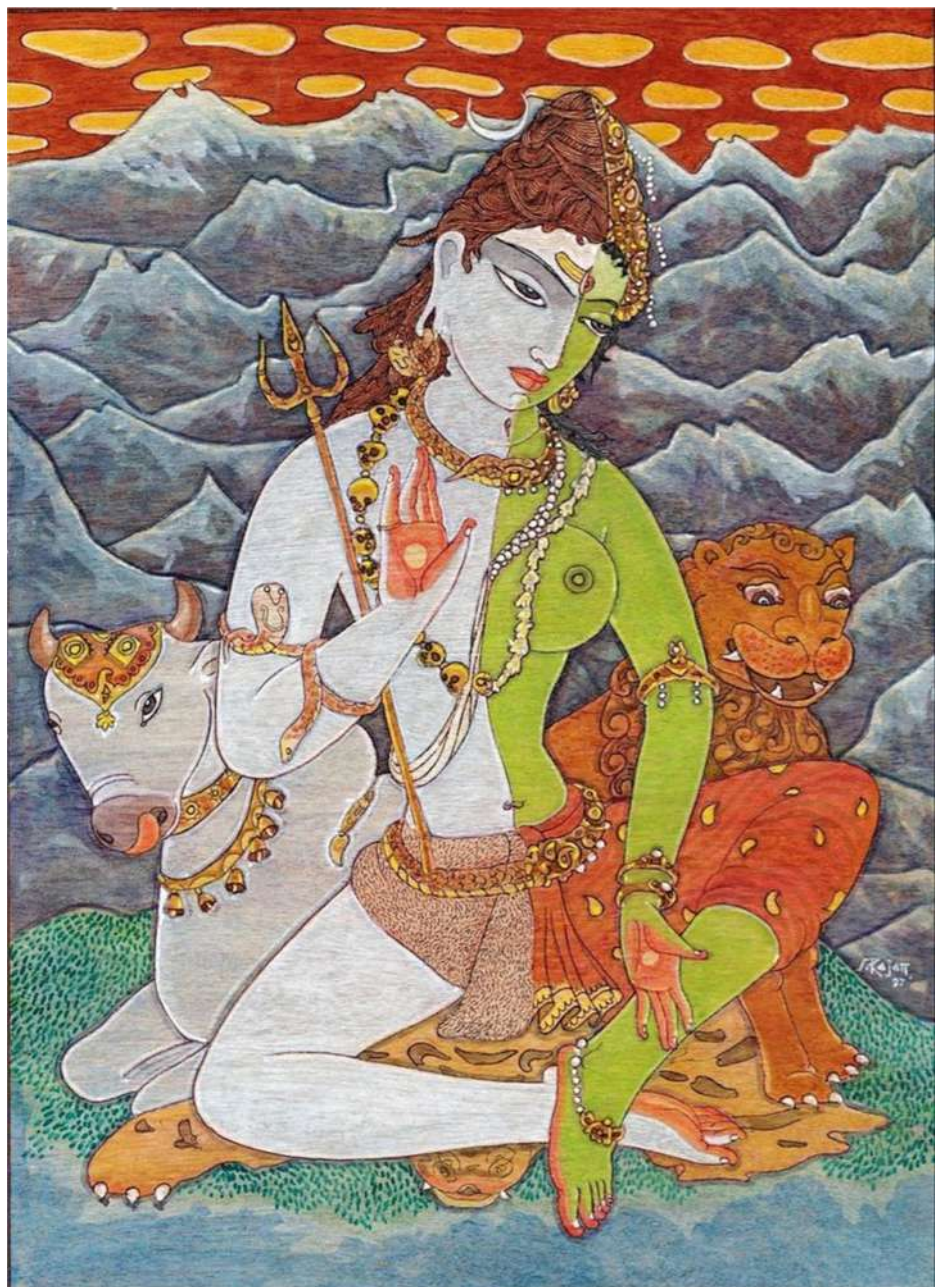
সৃষ্টির আদিতে যখন সৎ বা অসৎ ছিল না, আকাশাদি পঞ্চভূত ছিল না, যখন মৃত্যু ছিল না, জীবনও ছিল না, দিবারাত্রির ভেদ ছিল না, তখনও বায়ু ব্যতিরেকেও নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন একম্ সেই একম্ পরশিব যখন বহু হবার ইচ্ছা করলেন, তখন একাকিনী ইচ্ছাশক্তিরূপিনী (ইচ্ছাশক্তিরূমাকুমারী) —শিবসূত্র ১-১৩) উমাকুমারী তাঁর বামউরু আশ্রয় করলেন। ইচ্ছাময়ীর স্পর্শের হিন্দোলে পরশিবের বুকে উত্থিত হলো মহানাদ ওঙ্কারধ্বনি বা আদিপ্রণব। প্রণবোত্থিত ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া এই ত্রিশক্তিই সৃষ্টির আদিকারণ। ইচ্ছাশক্তি উমাকুমারী থেকে জাগ্রত হল জ্ঞানময়ী ক্রিয়াশক্তি। ভঙ্গ হলো সমাধি। শুরু হলো আনন্দ তাণ্ডবা তাণ্ডবের আনন্দে জেগে উঠল আনন্দাত্মিকা জ্ঞানশক্তি। সেই জ্ঞানঘন আনন্দ থেকেই সর্বভূতের উৎপত্তি, আনন্দেই স্থিতি এবং অন্তে আনন্দেই বিলীন হওয়া। ওই আনন্দ থেকে ক্রমে ক্রমে



সৃষ্টি হল আনন্দাকাশ,
 আনন্দাকাশে বইল আনন্দবায়ু
 সেই বায়ুর ঘর্ষণে উৎপন্ন হলো
 আনন্দতেজঃ, যে তেজ
 শীতল হয়ে ছোটালো
 আনন্দরসের ফোয়ারা, তাতে
 ভেসে উঠলো আনন্দধন
 পৃথিবী — যাকে বেদান্ত
 অপঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক নামে
 আখ্যায়িত করেছে। ওই
 উদ্দাম উন্মত্ত আদিম
 আনন্দনৃত্যে আদিপিতা
 আনন্দভৈরব ও আদিমাতা
 আনন্দভৈরবীর নিবিড় আনন্দ
 সম্ভোগের শিহরণে স্ফুটতর
 হল দুটি গুহ্য বীজমন্ত্র —
 শিববীজ হসঙ্কমলবরয়ুঁ ও
 শক্তিগর্ভ সহস্কেমলবরয়ী, জন্ম
 নিল হংসঃ পদ বা হেসীঃ।



পূর্বকল্পে প্রলয়কালে ত্রিলোচন ত্রিভুবন দক্ষ করে যে ভস্মে কারণসলিল সিঞ্চন করে সর্বাঙ্গ
 বিভূতিলিপ্ত হয়ে বিশ্বগোপন করে সমাধিস্থ হয়েছিলেন — আজ সৃষ্টির প্রারম্ভে
 আনন্দনৃত্যের পরিশ্রমে সেই ক্লিন্ন বিভূতির জলাংশ বিগলিত হয়ে নিম্নে অসীম অগাধ
 জলরাশি মধ্যে অনন্তশয্যায় শায়িত এক নীলপুরুষরূপে প্রতিভাত হলো এবং শুভ্রভস্মের
 অপরাংশ উর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে শ্বেতহংসাকারে বিরাজ করতে লাগলো। তখন
 অঘটনঘটন পটীয়সী আনন্দভৈরবী নিজ লীলায়িত দক্ষিণ করকমল প্রসারিত করে ওই
 নীলপুরুষ ও শ্বেতহংসের মধ্যে সংযোগ রচনা করলেন। এতক্ষণে বিচ্ছিন্ন ছবিখানা সুস্পষ্ট
 হলো, দেখা গেল কারণসলিলে রচিত অনন্ত শয্যায় যোগনিদ্রামগ্ন ভগবান বিষ্ণুর
 নাভিকমলে প্রজাপিতা ব্রহ্মা প্রথম নয়ন উন্মীলন করছেন।





উপরোক্ত এই রূপকধর্মী কাহিনী আদি-শিবরাত্রির কথা। লোকাযত মতে শিবরাত্রি হর-পার্বতীর বিবাহ রজনী। গল্পের শুরুতে যে আদিম-রাত্রি বর্ণিত হয়েছে তা নাসদীয়-রাত্রি ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে তা বিস্তারিত হয়েছে। এই রাত্রিতত্ত্ব গীতামুখে শ্রীভগবান সুস্পষ্ট করেছেন — “অজ্ঞানাবদ্ধ জীবের পক্ষে যা রাত্রিস্বরূপ, স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীগণ সেই রাত্রিতে জাগরিত থেকে আত্মসাক্ষাৎকার অনুভব করেন, আর যে তুচ্ছ বিষয়ানন্দে তামসী জীব

বিভোর, তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট তা রাত্রিস্বরূপ।” সাধারণের অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানস্বরূপ এই রাত্রিই শিবরাত্রি। ‘আত্মীয়তে মনসা বুদ্ধ্যা ইন্দ্রিয়ৈর্বা ইতি আহারঃ’ — তাই ইন্দ্রিয়পথে প্রপঞ্চবিষয় আহরণ না করাই অনাহার। এটিই শিবরাত্রিতে জাগরণ ও উপবাস-বিধানের গূঢ় তাৎপর্য। এই কাহিনীতে উক্ত আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর মিলন — উমালিঙ্গিত বিশ্বরূপের আদি অর্ধনারীশ্বর বিগ্রহ, যা থেকে এই প্রপঞ্চ বিস্তার হয়েছে। শিবরাত্রির প্রকৃত তত্ত্ব শিব ও শিবার অভেদজ্ঞানে নিহিত আছে, যা ক্রমশঃ স্ফুটতর হবে।

॥৯॥

স্থিতিতত্ত্ব ও ব্যক্ত-শিবরাত্রি :—

মধুকৈটভ নিহত হলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হলা। তখন বিবাদমান ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে মাঘ মাসের (গৌণ ফাল্গুন) কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর



মহানিশায় কোটিসূর্যসমপ্রভ
অনাদিলিঙ্গ আবির্ভূত হলেনা
ঈশান সংহিতায় লিখিত
হয়েছে—

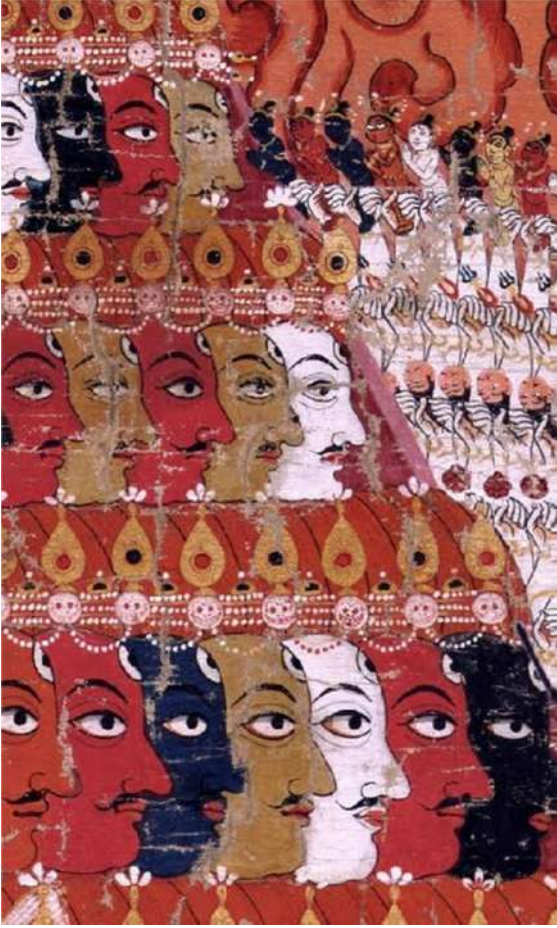
“মাঘকৃষ্ণচতুর্দশ্যামাদিদেবো
মহানিশিঃ। শিবলিঙ্গতয়োদ্ধৃতঃ
কোটিসূর্যসমপ্রভঃ।

তৎকালব্যাপিনী গ্রাহ্যা
শিবরাত্রিব্রতে তিথিঃ।” — এই
হলো ব্যক্ত-শিবরাত্রি। তখন
থেকেই সুরাসুরনর সকলেই এই
ব্রতের অনুষ্ঠান করে আসছেন।
সৃষ্টির আদিতে ওই যে মহেশ্বর
ভেবেছিলেন — ‘একং বহু
স্যাম্’, ‘আমি এক, বহু হব’
তাতেই আকাশাদি ক্রমে এই
জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি। তিনি



শুধু এই জগৎ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হলেন না, ‘তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ’ প্রতিটি বস্তুর অন্তরে
প্রবেশ করলেন। সব চৈতন্যময় হলো। ‘রসো বৈ সঃ’ — সেই আনন্দরসঘন পুরুষের
সংযোগবশতঃ ‘আনন্দেন জাতানি জীবন্তি’ — সর্বভূত আনন্দের দ্বারা বুদ্ধি পেলে। ভগবান
ভূতনাথ প্রসাদবীজ — ‘হৌং’ মন্ত্রে অষ্টমূর্তিতে জগৎ ছেয়ে ফেললেন। জগতের কোন
কণাই তাঁর অশেষ কৃপাকণা থেকে বঞ্চিত হলো না। হৌং-বীজের ‘হ’কার সর্বব্যাপী হরকে
বোঝায়, ‘ওঁ’কার অনুগ্রহাত্মিকা গৌরীশক্তি, নাদ ত্রিতাপহারী, বিন্দু মুক্তিদায়ক। তাঁর
ক্ষিতিমূর্তির নাম হলো ‘সর্ব’, জলমূর্তি ‘ভব’, অগ্নিমূর্তি ‘রুদ্র’, বায়ুমূর্তি ‘উগ্র’, আকাশমূর্তি
‘ভীম’, যজমানমূর্তি ‘পশুপতি’, সোমমূর্তি ‘মহাদেব’ ও সূর্যমূর্তি ‘ঈশান’ নামে খ্যাত হলো।
পার্থিব বস্তু দিয়ে গঠিত যত মূর্তি — সেখানে ‘সর্ব’-ই সর্বসর্বা। বাণেশ্বর, শালগ্রামাদি যত
বিগ্রহ সেই সমস্তে তিনি ‘সর্ব’ নামে নিজবিভূতি ব্যাপ্ত করলেন। ‘যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা
আছে দেহভাণ্ডে’। মূলাধারে তিনি হলেন ক্ষিতিতত্ত্বা মন্ত্র উঠলো — ‘ওঁ হৌং সর্বায়





ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ॥ ভবসাগরের
কাণ্ডারী এবার জলে প্রবেশ
করলেন, নাম হলো — ‘ভব’।
যত নদী-কূপাদি তীর্থসহ যা কিছু
জলময় সেখানেই ভবনাথের
আভাস। তিনিই দেহভাণ্ডের
স্বাধিষ্ঠানচক্রে হলেন জলতত্ত্ব।
মন্ত্রধ্বনি বাজলো — ‘ওঁ হৌং
ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ॥ জগতের
যত তেজতত্ত্ব সেখানে তিনি
‘রুদ্র’। প্রদীপ্ত হোমানলে তাঁর
স্বাহা-স্বধা-বষট্কারাদির প্রভা।
আহুনীয়, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য
এমন কত নামা মনিপুরচক্রে
অগ্নিরূপীর মন্ত্র উঠলো — ‘ওঁ
হৌং রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ॥
অন্তরীক্ষে তাঁর প্রবাহিত মূর্তি বায়ু
নাম — ‘উগ্র’। সেখানে তিনি
পিতৃগণরূপে উপাসিত।
অন্যতঃ তিনি বায়ুতত্ত্ব,

সেখানে তাঁর মন্ত্র শোনা গেল — ‘ওঁ হৌং উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ॥ আকাশে তাঁর নাম
‘ভীম’ সেখানে তিনি দেবগণরূপে পূজিত। বিশুদ্ধচক্রে আকাশতত্ত্বে তাঁর মন্ত্র — ‘ওঁ হৌং
ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ॥ যিনি উপাস্য তিনিই উপাসক হয়ে উপাসনার আয়োজন
করলেন — ‘শিবো ভূত্বা শিবং যজেৎ’। যজমান মানে উপাসকা তিনি যখন যজমান হন
তখন তাঁর নাম — ‘পশুপতি’। পশু (জীব), পাশ (মায়া) ও পতির (প্রভুর) সমাহারে তিনি
পশুপতি আজ্ঞাচক্রে তিনি যজমান বা অহংতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তখন মন্ত্র ধ্বনিত হলো
— ‘ওঁ হৌং পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ॥ পুনরায় তিনি চন্দ্রে, অমৃতে ও সোমরসে
সোমরূপে প্রকাশিত হলেন। এই সোমই স্থূল-সূক্ষ্ম-পর অনুভূতি। তখন তাঁর নাম -



‘মহাদেব’। তিনি আকাশে চন্দ্র, অন্তরে মনস্তত্ত্ব, স্বর্গে অমৃত ও দেহাভ্যন্তরে ইড়া বা চন্দ্রনাড়ী হলেন। আজ্ঞাচক্রের উর্ধ্বে সোমচক্রে তিনি অমৃতময়, ঝংকৃত হলো মন্ত্র — ‘ওঁ হৌং মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ’॥ তারপর তিনি আকাশে সূর্য ও দেহমধ্যে সূর্যনাড়ী বা পিঙ্গলা রূপে প্রকটিত হলেন। ওই সূর্যই প্রসবিতা, পালয়িতা, বিলয়িতা এবং পরতত্ত্ব। তখন তাঁর নাম হলো ঈশানা। সুষুম্না নাড়ীর শেষ প্রান্তে ভানুচক্রে পরতত্ত্বের মন্ত্র উচ্চিত হলো — ‘ওঁ হৌং ঈশানায় সূর্যমূর্তয়ে নমঃ’॥ এইভাবে সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে তিনিই স্থিতিলাভ করলেন।

জগৎ পালনে শিব অন্ধকাসুর, গজাসুর, ত্রিপুরাসুর ইত্যাদি বহু অসুর নাশ করেছেন। অন্যদিকে গঙ্গা, সরস্বতী, নর্মদা, শিপ্রার মতো প্রাণপ্রবাহিণী নদীসমূহ তাঁরই দ্বারা প্রবাহিত। জগৎ রক্ষায় তাঁর সবচেয়ে বড় আত্মত্যাগ হল। হলাহল বিষপান। যে বিষ ধারণ করার শক্তি ত্রিভুবনে কারও ছিল না, সেই ভয়ঙ্কর কালকূট তিনি অক্লেশে নিজ কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন। বিষ পূরকে দেহভাণ্ডের নাশ, রেচকে ব্রহ্মাণ্ডের নাশ কিন্তু কুম্ভকে উভয়েরই স্থিতি। প্রাণায়ামের এই গুহ্য সংকেত যিনি জানেন তিনি স্বয়ং মহাযোগী শিব। জগত্তারিণী দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা তারা-মা শিবের কণ্ঠে এই বিষ স্থিত করেন। দেবী তারিণী শিশুরূপী শিবকে (সদ্যোজাত মহাকালকে) যখন সুধাময়ী স্তন্যদানে বিষজ্বালা শান্ত করলেন, তখন শিব হলেন অক্ষোভ্য ভৈরব। পুনরায় শিব শক্তির সম্মিলনে জগৎ রক্ষা পেলে। লোক-প্রচলিত মতে দেবগণ সেদিন রাত্রি জাগরণ করে নৃত্য গীত ও বাদ্যে শিবকে আনন্দিত করেছিলেন। এই হলো ব্যাক্ত-শিবরাত্রি।

এখন জানা প্রয়োজন — শিব কে? রাত্রি কি ও শিবরাত্রি কাকে বলে? ‘শী’ ধাতুর অর্থ শয়ন করা, বন্ প্রত্যয়যোগে শিব হয়েছে। (‘‘শেতে অস্মিন্ সর্বম্, শেতে অনেন বা’’ — শব্দার্থচিন্তামণি) অর্থাৎ — যাতে সকলে শয়ন করে বা স্থিতিকালে যার দ্বারা ধৃত







হয়ে সকলে অবস্থান করে ও লয়কালে যাতে লীন হয় তিনিই শিবা আবার “শেতে তিষ্ঠতি নন্দরতিভ্যাং ন বিক্রিয়তে — গুণাবস্থারহিতঃ শান্তঃ শিবঃ শম্ভুঃ” (—উগাদিবৃত্তি)। অর্থাৎ, যিনি ধ্রুব আধারে নির্বিকারভাবে শয়ন করে থাকেন তিনিই শিবা রাত্রি কি? রাত্রি স্বয়ং আদ্যাশক্তি শিবা, একথা রাত্রিসূক্তে স্পষ্ট। এখন শিবরাত্রির সংজ্ঞা জানব — মাধবাচার্য কালমাধব গ্রন্থে বহু বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে শিবরাত্রি শব্দ যোগরূঢ়া শিবের প্রিয়া রাত্রি যে ব্রতে অঙ্গরূপে বিহিত হয়, সেই ব্রতকে শিবরাত্রি বলে। (“শিবস্য প্রিয়া রাত্রিঃস্মিন্ ব্রতেহঙ্গত্বেন বিহিতা, তদ্ ব্রতং শিবরাত্র্যাখ্যমা” — কালমাধব)। এতক্ষণের আলোচনায় সিদ্ধান্ত — এই ব্যক্ত শিবরাত্রিতে তারা-মায়ের ক্রোড়ই সেই ধ্রুব আধার — যেখানে শিব নিরন্তর শায়িত, নীলবর্ণা তারাদেবীই স্বয়ং রাত্রিরূপিণী আদ্যাশক্তি, দেবগণের নৃত্যগীতাদি — সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শিবশক্তির অভেদ উপাসনা, নীলকণ্ঠের অক্ষোভ্য (দেবী তারার ভৈরব) অবস্থাই জগতের স্থিতি।





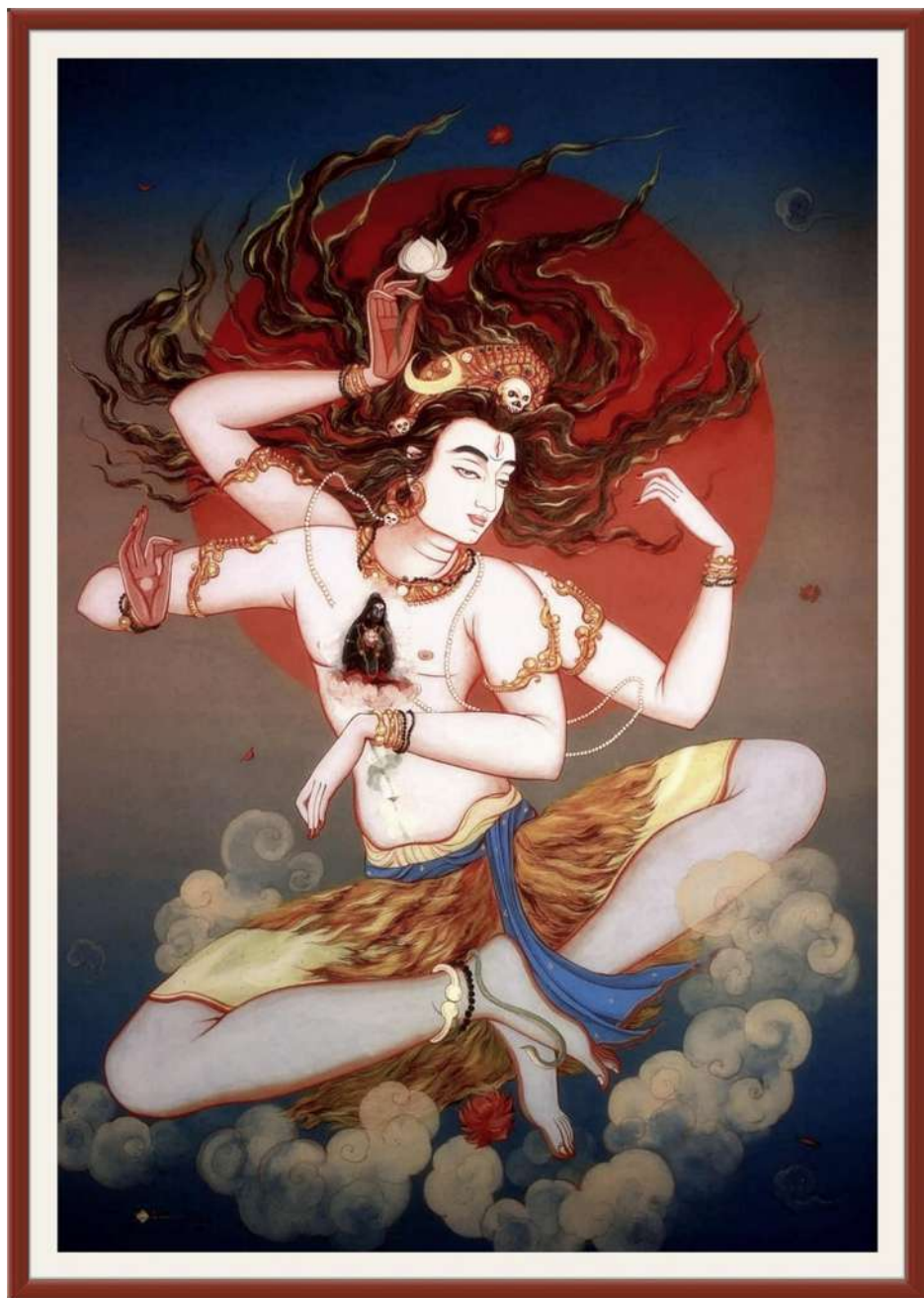
॥১০॥

সংহারতত্ত্ব ও অব্যক্ত-শিবরাত্রি

:—

‘রোদনাং রুদ্রঃ’ — রোদন বাচক রুদ্ ধাতু থেকে রুদ্র শব্দের উৎপত্তি। যিনি জন্মসময়ে উচ্চস্বরে রোদন করেছিলেন এবং অন্তিমে যিনি সকল জীবকে রোদন করান — তিনিই সৃষ্টিকালে ব্রহ্মক্রোধে তাঁর ভ্রমধ্য থেকে তমোময় রুদ্ররূপে আবির্ভূত হন। অনাদিলিঙ্গের প্রাদুর্ভাব সময়ে শিব ব্রহ্মাকে বর দিয়েছিলেন যে, তিনি ব্রহ্মার থেকে উৎপন্ন হয়ে তাঁকে সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করবেন। রুদ্ররূপ শিবের সংহারমূর্তি। অজ, একপাদ, অহির্ব্রহ্ম ইত্যাদি এই এগারো জন রুদ্র শিবাবতারা একাদশ

রুদ্র জীবের একাদশ ইন্দ্রিয় স্থানীয়; কারণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কমেন্দ্রিয় ও মন — অন্তকালে এই একাদশ ইন্দ্রিয়ই জীবকে রোদন করায়। আবার এই একাদশ ইন্দ্রিয়ই সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত হলে মুক্তির কারণ হয়। সাধারণতঃ মানুষ ধ্বংস বা মৃত্যুকে অজ্ঞানবশতঃ ভয় পায়। রুদ্রের সংহারশক্তির ভয়াবহতায় শাস্ত্রসমূহ বিকম্পিত। ‘রুদ্রমুখে সবাই ডরায়’। ঋষিরা প্রার্থনা করছেন — ‘তাং কুরু মা হিংসীঃ’, মানে — ‘হে রুদ্র! আমাদের হিংসা করো না’। অন্যত্র প্রার্থনা করছেন, “আবিরাবির্ম এধি, রুদ্র যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্” মানে, ‘হে রুদ্র! তুমি আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করা তোমার যে করুণাপূর্ণ দক্ষিণমুখ, তাঁর দ্বারা আমাদের নিত্য রক্ষা করা’ ব্রহ্মার সৃষ্টিতে এই তমোময় ধ্বংসমূর্তির কি প্রয়োজন? প্রতিমুহূর্তের ধ্বংসই জীবনকে পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে এগিয়ে দেয়। কিভাবে? মনে করুন, কোন কাজ কিভাবে করব সেই বিষয়ে আমার মাথায় একসাথে দশটি চিন্তা ঘুরছে, কিন্তু আমি তো একসাথে কেবলমাত্র একটি চিন্তাই কার্যকারী করতে পারি, তাহলে বাকি



ন'টি চিন্তাকে ধ্বংস করতে
হবো হ্যাঁ, এভাবেই আমরা
নিজেরাই রুদ্র হয়ে
প্রতিনিয়ত নিজেরই
অজ্ঞাতসারে একটা সৃষ্টির
অন্তরালে ন'টি কার্য ধ্বংস
করি। অনুরূপে আমাদের
মাথায় অতীতের যত দুঃখের
বোঝা স্মৃতি হয়ে রয়েছে,
তার অন্তত কিছুটাও যদি
আমরা বিনাশ করতে বা
ভুলতে না পারতাম — তবে
আমাদের প্রতিমূর্ত্তের বেঁচে
থাকা দুঃখভারে দুর্বিষহ হয়ে
উঠতো। আরো গভীরভাবে



ভাবলে অবিদ্যাময় মায়াপ্রপঞ্চ বিনষ্ট হলে তবেই তো ব্রাহ্মীস্থিতি আসে। রুদ্র হলেন খাদ্য
পিরামিডের সর্বোচ্চ খাদক, যিনি প্রলয়কালে ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত সর্ব জীবকে গ্রাস করেন।
রুদ্রাধ্যায়ে তাঁকে ভিষক বা বৈদ্য বলা হচ্ছে, কারণ ডাক্তার যদি রোগীর নষ্ট হয়ে যাওয়া
হাত বা পা না কাটেন তবে সারা শরীর পচে নষ্ট হয়ে যাবে। যেখানে রুদ্র সেখানেই ধ্বংস,
যেখানেই ধ্বংস সেখানেই নতুন সৃষ্টির বীজ বপন হয়। রুদ্রতত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা
— অহংকারের অধিষ্ঠাতা রুদ্র। এই অহং-এর জ্ঞানই বন্ধনের কারণ (‘জ্ঞানং বন্ধঃ’ —
শিবসূত্র ১-২)। শুনলাম যে — ‘আমার চাকরি হয়েছে’। আমি আনন্দে ফেটে পড়লাম।
পরক্ষণে শুনলাম — ‘আমার মা মারা গেছেন’। আমি দুঃখে ভেঙ্গে পড়লাম। আচ্ছা, যদি
শুধু শুনতাম ‘চাকরি হয়েছে’ তাহলে কি আনন্দ হতো? কার চাকরি হয়েছে? কত
লোকেরই তো চাকরি হচ্ছে। অথবা, শুধু যদি শুনতাম ‘মা মারা গেছে’ তবে কি দুঃখ
পেতাম? কত লোকেরই তো মা ক্ষণে ক্ষণে মারা যাচ্ছেন। না, কেবলমাত্র ‘আমার চাকরি’
বা ‘আমার মা’ এই ‘আমার’ কথাটি মাথার মধ্যে বারবার ঘুরপাক খেয়ে যত সুখ অথবা
দুঃখের কারণ হয়েছে। অহংযোগেই বন্ধন, অহং ত্যাগেই মুক্তি। এই আমি ও আমাররূপ





অহংপাশ দ্বারা পশুপতি রুদ্র পশু-জীবকে বন্ধ বা মুক্ত করেন। যখন মুক্ত করেন তখনই রুদ্রের কল্যাণকারী দক্ষিণমুখ দর্শন হয়।

শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় মদনকে মোহিত করে ‘মদনমোহন’ নাম নিয়েছেন, অন্যদিকে শিব সেই মদনকেই ভস্ম করে হয়েছেন ‘মদনদহন’। মলিন অহংকার বা অবিদ্যা থেকে কামের উৎপত্তি, তার থেকে जागे काम পূরণের সংকল্প ও সংকল্প থেকে কর্মের উদ্ভব, ক্রমে সেই কর্ম থেকেই হয় বন্ধন। মদনের পঞ্চবাণ আসলে পঞ্চতন্মাত্রাত্মক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের মোহ। সেই মোহের সুখস্মৃতিতে জীব বারবার এই সংসারে ফিরে ফিরে আসে ও নানাবিধ যাতনাভোগ করে। ঈশ্বরের কাম — নিজে এক হয়েও বহু হবার খেলা। ঈশ্বরের অহং — ‘শিবোহং’, জীবের অহং ‘অহং কৃষ্ণঃ, অহং স্থূলঃ ... ইত্যাদি’। তাই ঈশ্বরের বন্ধন নেই, যেমন সাপের মুখে বিষ থাকলেও সেই বিষে সাপ মরে না। পঞ্চতন্মাত্রাত্মক ‘হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ ঋঁ শ্রীঁ’ মন্ত্রে মদননিষ্কিপ্ত পঞ্চবাণ যখন শিবহৃদয় স্পর্শ করে, তখন উন্মোচিত হয় উর্ধ্বনেত্র, স্ফূরিত হয় আজ্ঞাচক্রের বীজ ‘হেসাঁঃ’ (হ=শিব, সোঁঃ=পরাসক্তি), যেখানে নিত্যমিলিত শিবশক্তির কখনও বিচ্ছেদ নেই, সেই অভেদজ্ঞানে ভস্মীভূত হয় কামদেবা পুনরায় শিব নেত্র নিমীলন করেন। নেমে আসে শিবরাত্রি।





শিবের সাথে মহারাত্রি পদ
অস্থিত হয়ে মহাশিবরাত্রি
হয়েছে। ‘রাতি (দদাতি)
অভীষ্টম্ ইতি রাত্রিঃ।’ —
যা অভীষ্ট দান করে, তাই
রাত্রি। রাত্রিতে অভীষ্ট কি?
রোগ, ভোগ বা যোগ সবই
রাত্রিতে অধিকাদিক
স্ফুরিত হয়। সুখ, দুঃখ,
বেদনা, যাতনা সবই
রাত্রিতে সুষুপ্তিকালে
লয়প্রাপ্ত হয়। জীব
বিশ্রামলাভ করে — এই
অভীষ্ট। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ত্রিবিধ
রাত্রি উক্ত হয়েছে। দারুণা
মোহরাত্রি, কালরাত্রি ও
মহারাত্রি অজ্ঞানরূপ
ভীষণ অন্ধকারে জীবগণ
মোহাচ্ছন্ন হয়ে যে

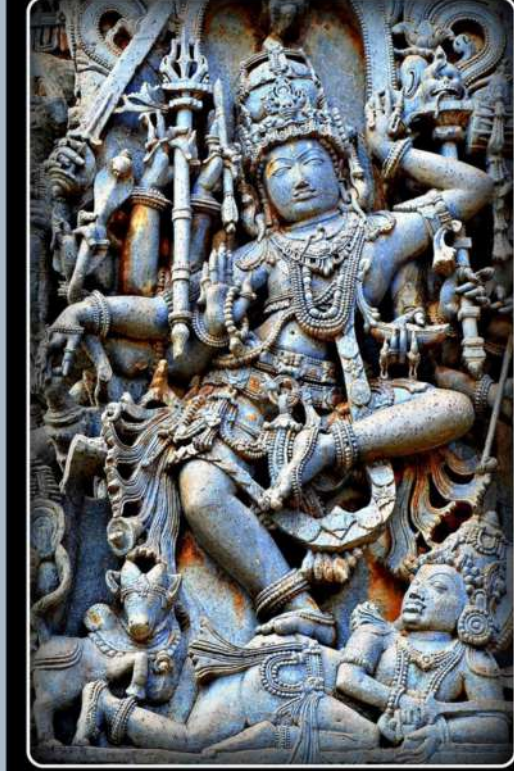
যাতনাভোগ করে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে যার নাশ নেই, সেই রাত্রিই জীবের মোহরাত্রি।
কালরাত্রিতে ব্রহ্মার লয় হয় (কালরাত্রি:— ব্রহ্মলয়োপলক্ষিতা — নাগোজী ভট্ট)।
মহারাত্রি:— সংসার প্রলয়রূপা রাত্রিঃ (কাশীনাথ)। প্রথম দু’প্রকার রাত্রি জীবের রাত্রি, তৃতীয়
প্রকার ঈশ্বরের রাত্রি বা মহারাত্রি। জীবরাত্রিরূপ নিত্য সুষুপ্তিতে জীবব্যবহার লুপ্ত হয়,
মহাপ্রলয়ে ঈশ্বররাত্রি বা মহারাত্রিতে ঈশ্বরব্যবহার লুপ্ত হয় (ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিঃ
পরমেশলয়াত্মিকা — দেবীপুরাণ)। এই মহারাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং আদ্যাশক্তি
ভুবনেশ্বরী। সেই প্রলয়রাত্রিতে জগৎ অব্যক্ত নামরূপ প্রাপ্ত হয় তাই সেই ঈশ্বরের মহারাত্রিই
মহাশিবরাত্রি। এই অব্যক্ত শিবরাত্রি সকল উপাধিবর্জিত পরমশিবের অবস্থা।



॥১১॥

তিরোধানতত্ত্ব ও গুহ্য- শিবরাত্রি :—

ঈশ্বরের পঞ্চকৃত্য — সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোধান (নিগ্রহ বা বন্ধ) ও অনুগ্রহ (কৃপা বা মোক্ষ)। শিবতত্ত্বের অনুসন্ধানের উপজীব্য শিবের এই পঞ্চলীলা। শিব সর্বদা শিবত্বে আরুঢ় থাকলে সৃষ্টি চলে না। তাই শিবত্বের নিমীলন বিশ্বের উন্মীলন। শিষ্টের পালনে দুষ্টির নিগ্রহই তিরোধান বা তিরোভাব। তখন তিনি শাস্তিদাতা বীরভদ্র। বিনিগ্রহকারী শিব ব্রহ্মার পঞ্চমমুণ্ড ছেদন করেছেন, মদনদহন করেছেন, যমের



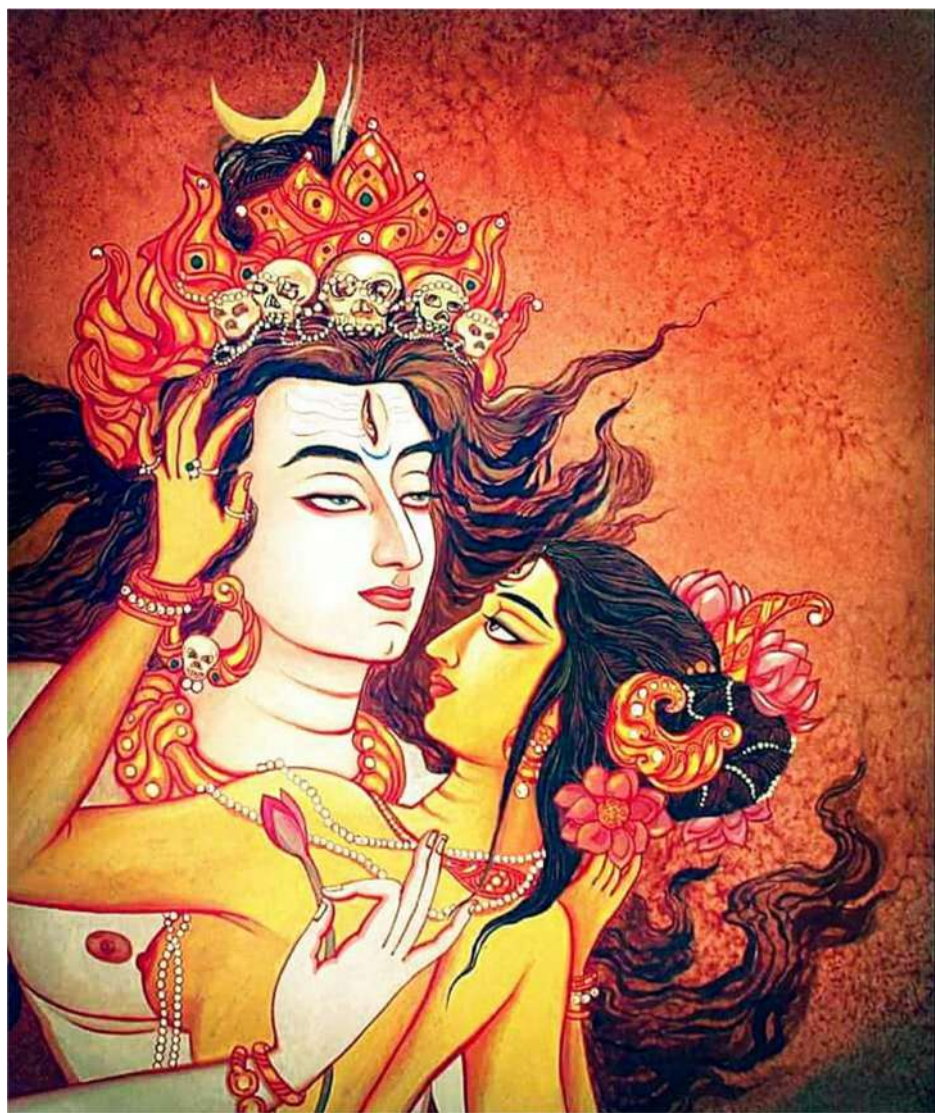
করেছেন প্রাণনাশ। কত অসুর নিধন করেছেন। শিবক্রোধসঞ্জাত প্রমথগণসহ বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে যেসব দেবতা শিবহীন দক্ষযজ্ঞে হবিঃ ভক্ষণ বা শিবনিন্দা শুনেছিলেন তাদের অশেষ দুর্গতি করেছিলেন। কাশীখণ্ডানুসারে — সেই দুঃসহ প্রমথগণ মৃগরূপ ধারণ করে পলায়নপর যজ্ঞের মস্তকছেদন, ভগকে নেত্রহীন, পৃষার দন্ত বিদারণ, সরস্বতীকে নাসিকাহীন, অদিতির ওষ্ঠকর্তন, অগ্নির জিহ্বা উৎপাটন, বায়ুর বৃষণচ্ছেদ, যমকে বন্ধন ও অপমান, নৈঋতকে কেশাকর্ষণ করে বক্ষে পদাঘাত, কুবেরকে ঘূর্ণন, বরুণসহ অন্য দেবতাদের উদর প্রপীড়ন করে ভুক্ত হবিঃ বমন করালেন। ইন্দ্র ময়ূরের ছদ্মবেশ ধরে আত্মরক্ষা করলেন। বীরভদ্র প্রবল যুদ্ধে বিষ্ণুকে পরাজিত ও তাঁর হস্তস্তম্বন করে ত্রিশূল দ্বারা বক্ষ বিদীর্ণ করতে গেলে দৈববাণীতে নিরস্ত হলেন। অবশেষে ঈশ্বর বিদ্রোহী দক্ষের মস্তক





চপেটাঘাতে ধড়চ্যুত
করলেন। শিবহীন যজ্ঞের
কুফল এইভাবে জগৎমাঝে
প্রকাশিত হলে ব্রহ্মার
মধ্যস্থতায় পুনরায় প্রমথগণ
দেবতাদের সুস্থ ও পূর্ববৎ
করলেন। শিব প্রথমপূজ্য ও
যজ্ঞের অগ্রভাগ
গ্রহণকারীরূপে নির্ধারিত
হলেন। তখন থেকে শিবের
উদ্দেশ্যে কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথি
উৎসর্গিত হলো। প্রতিমাসের
কৃষ্ণাচতুর্দশী মাসিক
শিবরাত্রি এবং ফাল্গুনের
শিবরাত্রি মহাশিবরাত্রি।
এখন নিগ্রহতত্ত্বের আলোকে
যে শিবরাত্রির কথা বলব, তা
বড়ই গুহ্যসাধনা।

পরম্পরাগত এই সাধনা কাশ্মীর শৈবদর্শনে আজও প্রচলিত। এই প্রক্রিয়ায় কাশ্মীরের
শৈবযোগীরা নিজশরীরে শিবরাত্রি অনুভব করেন। এ বিষয়ে শিবস্তোত্রাবলীতে প্রসিদ্ধ
শ্লোকের ব্যাখ্যা মণীষী সাধক ‘লক্ষণজু’ যেভাবে করেছেন — “যত্র সোহস্তময়মেতি
বিবস্বাংশ্চন্দ্রমঃ প্রভৃতিভিঃ সহ সর্বৈঃ। কাপি সা বিজয়াতে শিবরাত্রিঃ
স্বপ্রভাপ্রসরভাস্বরূপা।।” (শিবস্তোত্রাবলী - উৎপলদেব ৪.২২) মানে, যেখানে সূর্য (সূর্য =
প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতাজ্ঞান) অন্তর্গত হয়, যেখানে চন্দ্রের (মন বা সূক্ষ্মশরীরের) সাথে
অন্যান্য সমস্ত জ্যোতিষ্ক (সর্বপ্রকার সংকল্প, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থার জ্ঞান) অন্তর্গত হয় —
সেখানেই নিজমহিমায় উদ্ভাসিত হয় জ্যোতির্ময় তুরীয় শিবরাত্রি। কাশ্মীরের শৈবযোগীরা
মনে করেন বাইরের আকাশে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির সাথে আমাদের নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস
তুলনীয়। বুকভরা শ্বাস যেন পূর্ণিমা তিথির মতো পরিপূর্ণ, যেন মনের অধিদেবতা চন্দ্রমা



মনঃকল্পিত জগৎরূপে পূর্ণব্যাপ্ত হয়েছেন। শ্বাসত্যাগ যেন ক্রমশঃ চন্দ্রের ক্ষয়প্রাপ্তি, ক্ষয় পেতে পেতে শ্বাসত্যাগের শেষ ক্ষণে যেন নেমে আসে কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত — ‘স্বপ্রভাপ্রসরভাস্বরূপা’ শিবরাত্রি বাইরের জ্যোতি যত হ্রাস পায় ততো জ্বলে ওঠে অন্তরের শিবজ্যোতি। প্রতিবার শ্বাসত্যাগ (চন্দ্রের অন্তঃগমন) ও পুনরায় শ্বাসগ্রহণের (সূর্যাস্তের) মধ্যে যে অতিসংক্ষিপ্ত বিরামের (বহিঃকুণ্ডকের) ক্ষণ, শৈবযোগীরা সেই ক্ষণে মনোনিবেশ করে শিবজ্ঞান প্রাপ্ত করেন। দক্ষযজ্ঞে দেবতারা যেন অস্থির ইন্দ্রিয়ের প্রতীক, তাঁরা বীরভদ্ররূপ শ্বাসনিগ্রহ দ্বারা নিগৃহীত হয়ে আত্মস্থ হয়ে যেমন শিবতত্ত্ব বুঝেছিলেন, তেমনভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিগ্রহ দ্বারা নিজের শরীরেই উক্ত স্বপ্রভাভাসিত শিবরাত্রিতত্ত্ব উপলব্ধি হয়।



॥১২॥

অনুগ্রহতত্ত্ব ও পরম-শিবরাত্রি :-

"গৌরী-নিরন্তর-বিভূষিত-বামভাগমা" যে সচ্চিদানন্দ মহাসাগরের দর্শনে নারদ ভক্তরাজ, যে বারিধির স্পর্শে মহামুনি শুক সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ, সেই সচ্চিদানন্দ সমুদ্রের তিন গণ্ডুষ জল পানে ভোলা-মহেশ্বর শব হয়ে রয়েছেন। গৌরীর নিরন্তর ভূজবন্ধনে ওই শবই মহাপ্রেমিক হয়ে দক্ষিণামূর্তি রূপ ধরে আপামরে চৈতন্যদান করে চলেছেন। আমার গৌরীর এমনই মহিমা। সেই উমালিপ্ত বিশ্বরূপই আদিগুরু, তাঁর থেকেই সর্ব বিদ্যার উৎপত্তি। তাঁর অনুগ্রহের ব্যাখ্যান স্বয়ং মা সরস্বতী যদি অনন্ত কাল ধরেও করেন তবুও তার ইয়ত্তা হবে না।

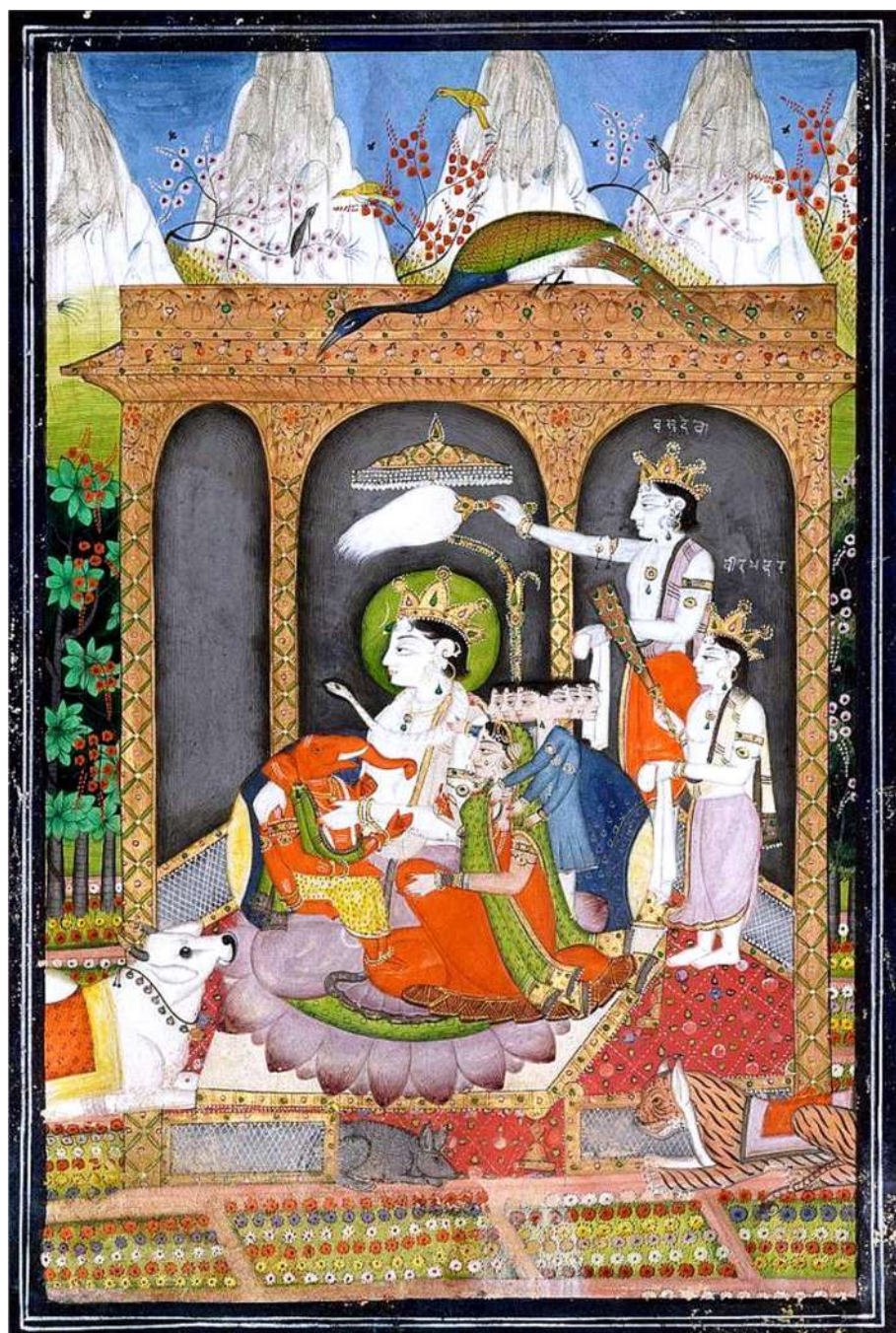




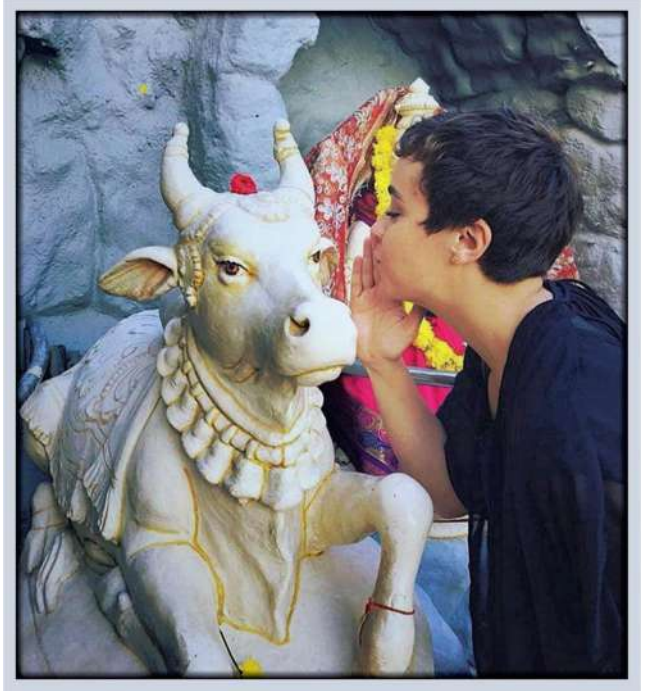
ব্রহ্মবিদ্যা, আগম, তন্ত্র, ব্যাকরণ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, চিকিৎসা, অস্ত্রবিদ্যাদি নিখিল জ্ঞানের জনক মহাদেবা জগতে এমন কোন্ দেবতা আছেন যার পুরীতে মরণে কীটেরও মুক্তি হয়, এমন কোন্ দেবতা আছেন যার বিগ্রহ স্পর্শের অধিকারী আল্লেচ্ছদ্বিজচণ্ডালী, এমন কোন্ দেবতা আছেন অজান্তে বিনা মন্ত্রে যাঁর তিথি উদযাপন করে মহাপাপীরও

মুক্তি হয়! তিনি একমাত্র শিব, তাঁর পরম কল্যাণদায়িনী তিথিই পরম শিবরাত্রি — যে তিথির ব্রত একমাত্র উপবাস ও রাত্রি জাগরণ, উপচার শুধু গঙ্গাজল আর বেলপাতা, পূজার মন্ত্র ‘বম বম মহাদেব’, যার পূজাধিকারী স্ত্রী শূদ্র থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সকলেই।

আমরা সকলে সেই ব্যাধের গল্প জানি যে ভাগ্যক্রমে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপবাসী থেকে রাত জেগে বেলগাছে উঠে নিজের অজান্তেই শিবরাত্রিতে বিনা মন্ত্রে বিশ্বমূলে শিবলিঙ্গে চারপ্রহরে চারবার জল ও বেলপাতা দিয়ে পরমপদ প্রাপ্ত হয়েছিল। এই গল্পের রূপকে আমরা এক পরম তত্ত্বের অনুমান করতে পারি। যেখানে বেলগাছ সুষুম্নাকাণ্ডের প্রতীক। কারণ, শাস্ত্রে বর্ণিত কল্পবৃক্ষ, যূপস্তুম্ব ও বেলগাছ এই সমস্ত সর্বাভিষ্ঠ পূরণকারী। প্রকৃতপক্ষে সুষুম্নারর মধোই কুলকুণ্ডলিনী, ইড়া-পিঙ্গলা, ষটচক্র সর্ব দেবদেবী অধিষ্ঠিত। সুষুম্নাকাণ্ডে কুলকুণ্ডলিনী জাগরন হলে সকল প্রাপ্তি হয়। গাছে চড়া ব্যাধ সুষুম্নাধিষ্ঠিত জীবাত্মা, যে ইন্দ্রিয়রূপ তীর ছুড়ে শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রারূপ আহর শিকার করে বদ্ধ হয়। রাত জাগা মানে জীবাত্মার অজ্ঞানরূপ তমোকে জয় করা, অনাহার মানে একাদশেন্দ্রিয়ে ভোগ্যবিষয় আহরণ না করা। বিশ্বমূলে শিবলিঙ্গ মানে গীতোক্ত উর্ধ্বমূল সনাতন অশ্বখ — যার মূল স্বয়ং ভগবান। শিবলিঙ্গ জ্যোতিষ্বরূপ নিরাকার ভাবের প্রতীক, যা সনাতন ধর্মে ‘জ্যোতির্লিঙ্গ’, তাই খ্রীষ্টধর্মে ‘Light of the World’, তাই ইসলাম ধর্মে আল্লাহর জ্যোতি বা ‘নূর’ বলে খ্যাত



হয়েছে। জল প্রাণশক্তির
প্রতীক, শিবলিঙ্গে জল
দেওয়া অর্থ পরমব্রহ্মে
পঞ্চপ্রাণকে আত্মতা
দেওয়া, কারণ শাস্ত্রমতে
জলই প্রাণ। বেলপাতার
তিনটি ফলক সত্ত্ব-রজঃ-
তম এই ত্রিগুণের প্রতীক,
শিবলিঙ্গে বেলপাতা
দেওয়ার মানে পরমব্রহ্মে
গুণত্রয়কে বিলীন করা।
শিবলিঙ্গে জল ও
বেলপাতা দেওয়া মানে
নিগুণ পরব্রহ্মে
প্রাণাদিবৃত্তি সমেত



তিনগুণ লয় করানো। মন্ত্রহীন পূজায় কৈলাসপ্রাপ্তি মানে কেবল নিদিধ্যাসন সহায়ে সহস্রারে
‘শিবোহম্’ জ্ঞানে সমাধিস্থিতি। শিব মানে মঙ্গল, রাত্রি মানে অভীষ্ট পূরণকারিণী
আদ্যাশক্তি। তাই সশক্তিক শিবের উপাসনায় পরমজ্ঞান দানকারী এই রাত্রিই পরম শিবরাত্রি।

॥১৩॥

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা এযুগের হরগৌরী :—

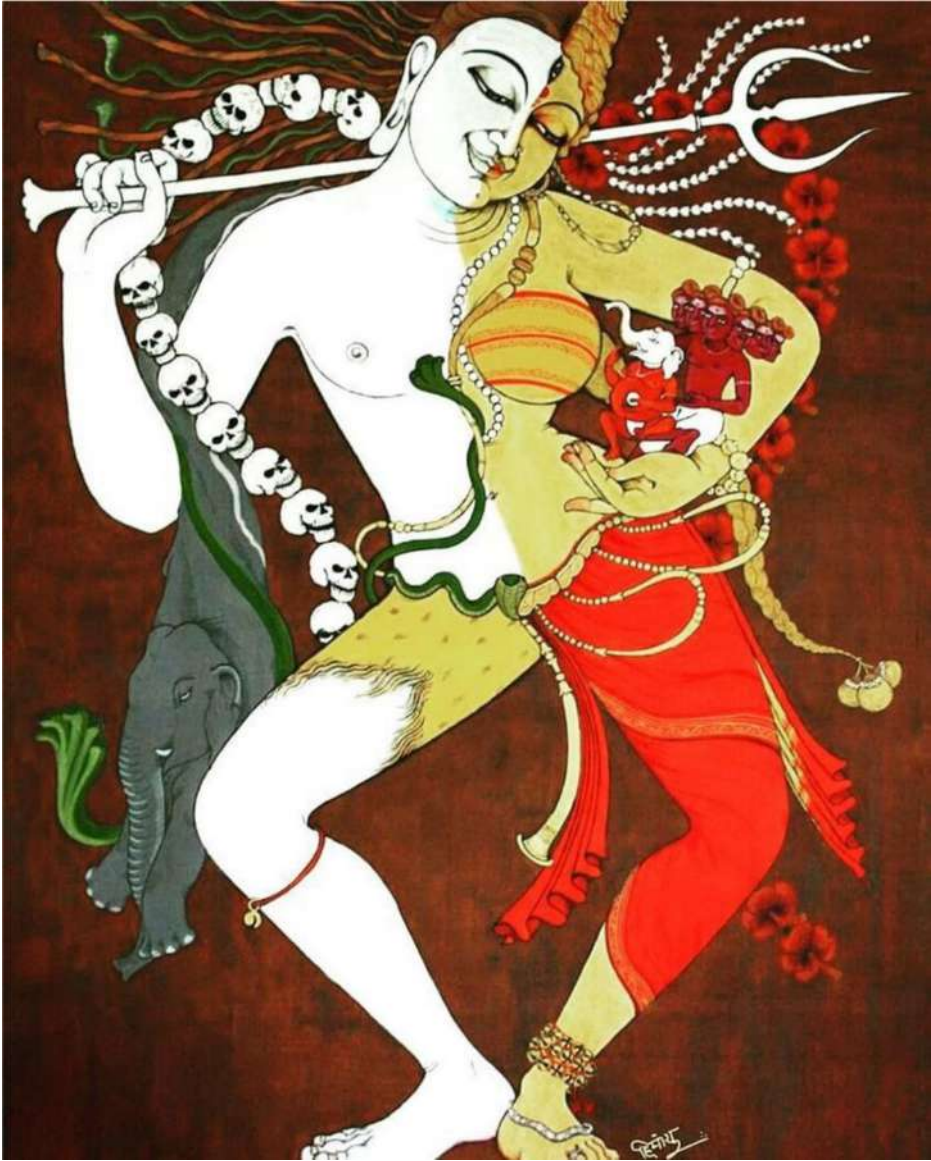
এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিবার হরগৌরীর সংসার। শিবের সংসার বহু বিরুদ্ধ বস্তুর একত্র বিচিত্র
সমাহারের সমন্বয়। শিবের কণ্ঠে বিষ অথচ শিরোস্থ চন্দ্রে অমৃত, অঙ্গে অপবিত্র চিতাভস্ম
অথচ জটায় পুণ্যতোয়া গঙ্গা। শিবপরিবারের বাহনদের সমাহার বড়ই বিচিত্র। বৃষ ও হাঁসের
শক্ৰ সিংহ, সাপের শক্ৰ ময়ূর, হুঁদুরের শক্ৰ পেঁচা, তবুও কারোর কোনো বিরোধ নেই,
ভূতপ্রেত দেবতা একসাথে সবাই আছে। এবার ঠাকুরের কথা বলি — ঠাকুরের কণ্ঠে বিষ
(ক্যান্সার) অথচ মুখে অমৃত (কথামৃত), জন্মলগ্নে ছাইয়ের গাদায় আবার মা দেখছেন পা
থেকে গঙ্গা বেরোচ্ছে। রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীতে রাম দত্ত একরকম লাটু আরেকরকম,

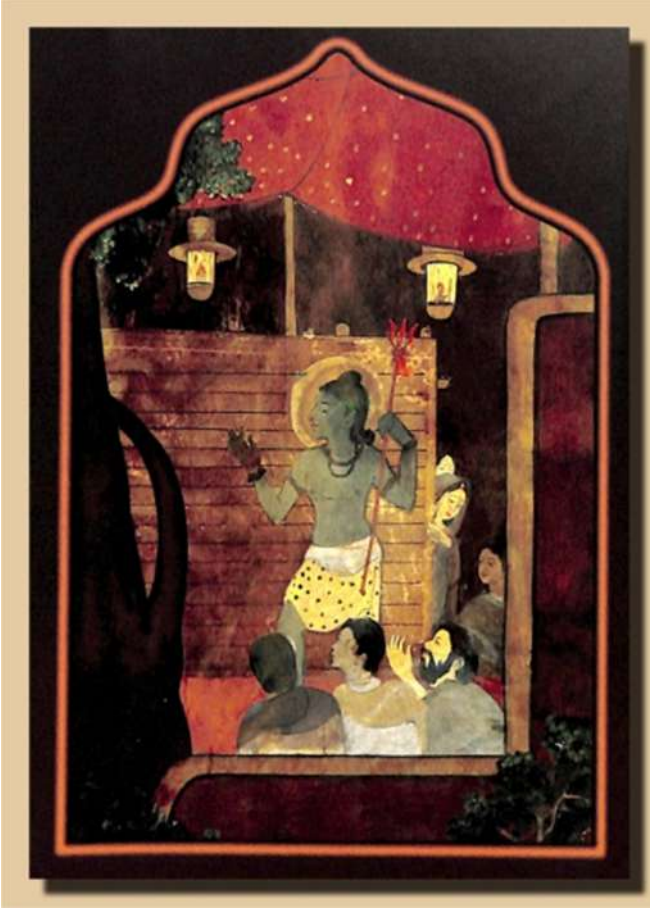




নিত্যগোপাল একরকম নিত্যনিরঞ্জন আরেকরকম, গিরিশ একরকম বাবুরাম আরেকরকম, কেউ ব্রাহ্ম তো কেউ বৈষ্ণব, কেউ শাক্ত তো কেউ বেদান্তী, কেউ নিত্যসিদ্ধ তো কেউ গুপ্তা-বদমাশ, কেউ বা মাতাল, কিন্তু সবাই একসাথে রয়েছে, কোন বিরোধ নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর-মায়ের সংসারে সন্ন্যাসী ও গৃহীভক্তের এক অপূর্ব বিচিত্র মিলনমেলা বসেছে। এই অদ্ভুত পরিবার সমস্ত জগতকে নতুন আলো দেখিয়েছে।

ঠাকুর ও মায়ের জন্মের আগেই শিব-পার্বতীর আগমনের সূচনা হয়েছিল। একদিকে ঠাকুরের মায়ের গর্ভে শিবজ্যোতির প্রবেশ, অন্যদিকে মায়ের মায়ের উদরে বেলতলায় কন্যাকাশক্তির প্রবেশ। একজন বাল্যকালে শিবরাত্রির রাতে শিবের ভাবে সমাধিস্থ হলেন, অন্যজনকে বালিকাবয়সে জগদ্ধাত্রীরূপে হলদেপুকুরের জমিদার দর্শন করলেন। একজন স্বমুখে স্বীকার করেছেন যে তিনিই যুগে যুগে অবতার, অন্যজন মেনেছেন লোকে তাঁকেই কালী বলে। একজনকে দক্ষিণেশ্বরে মথুরাবাবু একাধারে শিবকালীরূপে দেখলেন, অন্যজনকে উদ্বোধনে এক ভক্ত শায়িত অবস্থায় যুগলমূর্তিতে দর্শন পেলেন। অন্য পরম্পরার সাধিকা হয়েও উভয়কে হরগৌরীরূপে গৌরীমার মা গিরিবালাদেবী মনপ্রাণে বুঝেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও





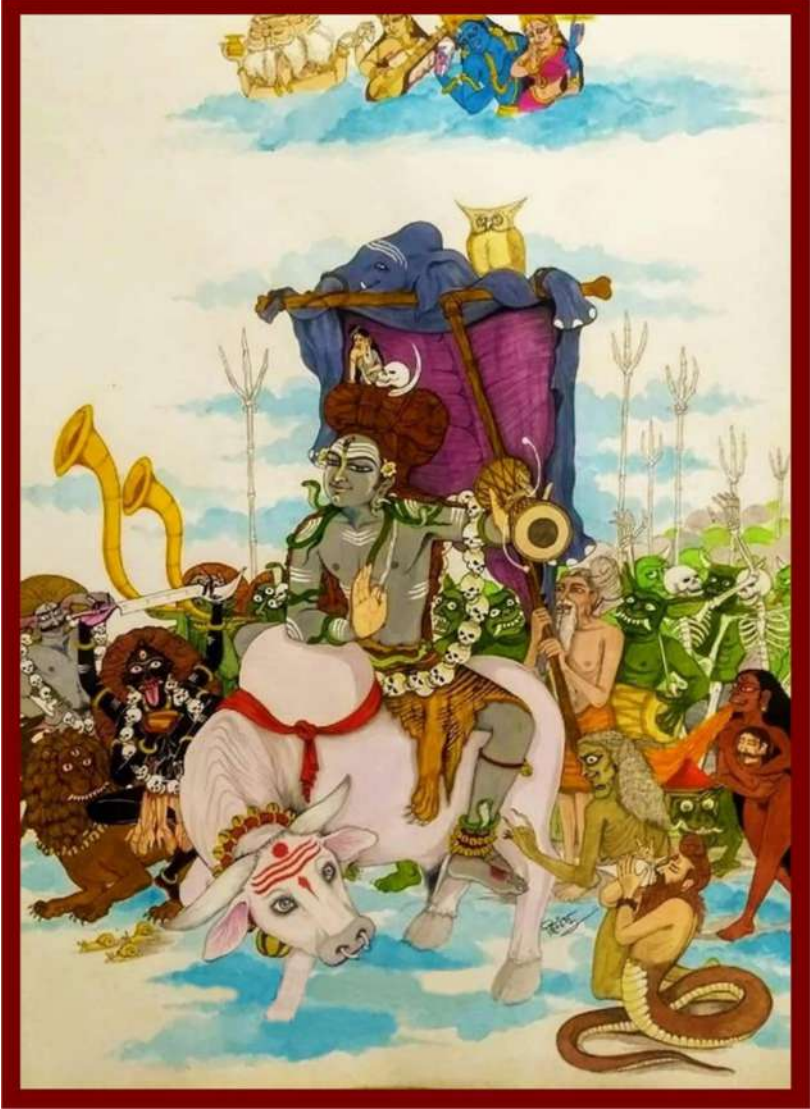
শ্রীশ্রীমাকে একত্রে
দর্শনের একটা ঘটনা
বলে শেষ করব,
রামকৃষ্ণ সারদা গ্রন্থে
দুর্গাপুরীদেবী সেই ঘটনা
অনেকটা এইভাবে
বলেছেন —

অসীমের মার বিশ্বাস
ছিল যে, ঠাকুরই বাবা
বিশ্বনাথ। আবার
ভাবতেন, তিনি যদি
বিশ্বনাথ, তবে তাঁর
সাজোপাজরা কোথায়?
একদিন নহবতে
লক্ষ্মীদিদির সাথে তার
কথাবার্তা হচ্ছিল, এমন
সময় ঠাকুর বেলতলার
দিকে যেতে যেতে
বললেন — ওগো,

তোমরা অত কি কথা বলছ? এসো, আমরা বেলতলায় গিয়ে বসি, সেখানে কথা হবো
লক্ষ্মীদিদি এবং অসীমের মাকে বেলতলার দিকে যেতে দেখে, গঙ্গা স্নানার্থিনী আরও দু'জন
মহিলা সঙ্গে গেলেন। তারা গিয়ে দেখেন, বেলতলায় ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। অসীমের মা দেখতে
পেলেন, - বৃহদাকার একটি সাপ ফণা বিস্তার করে ঠাকুরের পিছনে দুলছে, অদূরে আরও
কয়েকটি সাপ খেলা করছে। এই লোমহর্ষণ দৃশ্যে তার শরীর কন্টকিত হলো। - কী
সব্বরক্ষে! কি হবে এখন? কেন শিবের সাজোপাজ দেখতে আমার সাধ হয়েছিল? ভয়ে
অসীমের মা কাঁদতে লাগলেন। আর লক্ষ্মীদিদি একই সময়ে দেখলেন, ঠাকুর শিবের মত
যোগাসনে বসে আছেন, তাঁর বাম উরুতে বসে মাঠাকুরানী হাসছেন। তিনি ভাবেন, এটা
কেমন হলো! এইমাত্র খুড়ীমাকে নহবতে দেখে এলুম আমরা। দিনের বেলায় তিনি এখানে



এলেন কি করে? লক্ষ্মীদিদি ছুটে গেলেন নহবতো সেখানে খুড়ীমাকে দেখলেন, পরিধানে
ঠিক সেই শাড়ি। তাঁকে কিছুই না বলে পুনরায় ছুটলেন বেলতলায়। পুনরায় দেখলেন সেই
দৃশ্য। সপর্কুল ততক্ষণে চলে গেছে। কিন্তু ঠাকুর তখনও ভাবাবিষ্ট।







॥১৪॥

রুদ্রস্ততি :—

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়।

দুলিছে রুণ্ডমুণ্ডমাল খসিছে কটিতে ব্যাঘ্রছাল,
গলেতে ব্যাল করে কপাল বিভূতিলিপ্ত দীপ্তভালা
বাজিছে ডমরু বিকটতাল ববম্-ববম্ বাজিছে গাল,
প্রলয়কাল রুদ্রচাল দেখিয়া কাঁপিছে লোকপাল।
মেলে জটাজাল প্রমথপাল নাচে ভৈরব তাল-বেতাল,
মহাকালী সনে ক্রুরকরাল ভয়ালনৃত্যে নাচিছে কাল।



[লটপট্ট জটাপট্ট অট্ট অট্ট অট্টহাসা
ঘোরঘট্ট করিছে নট্ট নট্টরাট কৃতিবাসা।]
সর্ব অঙ্গ প্রলয়াঙ্গ মরে দ্রাভঙ্গে কত অনঙ্গ,
উর্ধ্ব গঙ্গ শততরঙ্গ উগরে গরল যত ভুজঙ্গ
নৃত্যরঙ্গ ললিতভঙ্গ বাজিছে দামামা ঘোর মৃদঙ্গ,
ভয়ালভঙ্গি দ্রাকুটিভঙ্গ কাঁপিছে তরাসে দিঙমাতঙ্গ।
ধ্বংসজঙ্গে রথতুরঙ্গ বহির্গর্ভে যেন পতঙ্গ,
গরজে জলদ জলধি মন্দ্র খণ্ড খণ্ড ললাটে চন্দ্রা।

